www.banglainternet.com

A Tale of Two Cities

(Charles Dickens)

Bangla Translation

Share this book with your Friends, Family.

read N share

এক

সতের শ পঁচাত্তর সালের নভেম্বর।

কনকনে ঠাণ্ডা রাত। শুটার'স হিলের চড়াই পথ বেয়ে উঠছে ডোভার মেইল। চারপাশে ঘন কুয়াশা। তার ওপর তুষার গলা পিচ্ছিল খাড়া পথ। এখানে-ওখানে গর্ত। যাত্রী বোঝাই কোচ টেনে তুলতে পারছে না ঘোড়াগুলো। এরই মধ্যে তিন-তিনবার থেমে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা তাই হেঁটে চলেছে কোচের পাশে পাশে। চোখে-মুখে তাদের আতঙ্কের ছাপ। এই বুঝি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল ডাকাত। ক'দিন আগেও ডাকাতি হয়েছে ডোভার মেইলে। রক্ষীকে মেরে ছিনিয়ে নিয়েছে যাত্রীদের সবকিছু।

চালকের আসনে দশাসই চেহারার কোচোয়ান। সপাং সপাং চাবুক হাঁকাচ্ছে আর মুখ খিস্তি করছে। কাদা-পানি ছিটিয়ে প্রাণপণে এগোচ্ছে ঘোড়াগুলো।

রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে কোচের পেছনে। টানটান পেশি। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। ডান হাতটা কোচ বাক্সের ওপর রাখা। আটটা গুলি ভরা পিস্তল রয়েছে ওই বাক্সে। যে কোনো ঝামেলার জন্য প্রস্তুত। সময়টা বড়ই খারাপ। চারদিকে শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। রক্ষীর মনেও সন্দেহ। একটু পরপরই তাকাচ্ছে যাত্রীদের দিকে। কে জানে, যাত্রীবেশে কোনো ডাকাত রয়েছে কি না এদের মধ্যে! যাত্রীদের মনেও সন্দেহ। মাঝে মধ্যে আড়চোখে তাকাচ্ছে সহযাত্রীর দিকে।

এমনি ভয় আর অজানা আশঙ্কায় দুলতে দুলতে চূড়ায় উঠল কোচ। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল কোচোয়ান। এবার নিচে নামার পালা।

কোচ বাক্সের পেছন থেকে নেমে এল রক্ষী। দরজা খুলল কোচের। প্রথম যাত্রী সবেমাত্র পাদানিতে পা রেখেছে অমনি হিস্‌হিস্‌ করে উঠল কোচোয়ান, 'কিছু শুনতে পাচ্ছ, জো?'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল রক্ষী। কান খাড়া করল। 'ঘোড়া আসছে মনে হয় একটা', বলতে বলতে নিজের জায়গায় চলে গেল সে। হাতে তুলে নিল গুলি ভরা অস্ত্র।

এগিয়ে আসছে খুরের আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে।

গর্জন করে উঠল রক্ষী, 'থাম! নইলে গুলি করব।'

কিছুটা দূরত্বে ঘোড়া থামাল অশ্বারোহী। ঘন কুয়াশার আড়ালে একটা ছায়ামূর্তির মতো লাগছে তাকে। সেখান থেকেই কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল সে, 'এটা কি ডোভার মেইল?'

'কেন?' গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রক্ষী। 'কী দরকার তোমার?'

'একজন যাত্রীকে দরকার।'

'কী নাম?'

'মিস্টার জারভিস লরি।'

'খবরদার! এক চুলও নড়বে না ওখান থেকে। আমি দেখছি ওই নামে কেউ আছে কি না।' ঘাড় ফিরিয়ে যাত্রীদের দিকে তাকাল রক্ষী।

কিন্তু রক্ষী কিছু বলার আগেই ভারী একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল যাত্রীদের ভেতর থেকে। 'আমিই জারভিস লরি। কে খুঁজছে আমাকে? জেরি নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার', দূর থেকে ভেসে এল আগন্তুকের কণ্ঠস্বর।

'কী ব্যাপার?'

'আপনার একটা চিঠি আছে, স্যার। টেলসন'স ব্যাংকের।'

কোচের কাছ থেকে একটু সরে এলেন মিস্টার লরি। রক্ষীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'লোকটা আমার পরিচিত। ওকে আসতে দাও।'

আগন্তুকের দিকে ফিরল রক্ষী। 'এস', বাজখাঁই গলায় বলল সে। 'তবে সাবধান। সঙ্গে কিছু থাকলে বের করার চেষ্টা কোরো না।'

কুয়াশার পরদা ভেদ করে ধীর কদমে এগিয়ে এল অশ্বারোহী। মিস্টার লরির কাছে এসে লাগাম টানল ঘোড়ার। তারপর ঝুঁকে এগিয়ে দিল এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ।

'ভয়ের কিছু নেই', রক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার লরি। 'আমি লন্ডনের টেলসন'স ব্যাংকের লোক। জরুরি কাজে প্যারিস যাচ্ছি। চিঠিটা পড়তে পারি তো?'

'অবশ্যই, স্যার।'

কোচ-বাতির আলোয় চিঠিটা পড়লেন মিস্টার লরি। মাত্র এক লাইনের চিঠি। 'ডোভারে রয়্যাল জর্জ হোটেলে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

চিঠি থেকে মুখ তুললেন তিনি। 'ঠিক আছে, জেরি। তুমি এখন যেতে পার। শুভরাত্রি।'

আর অপেক্ষা করলেন না মিস্টার লরি। দরজা খুলে উঠে পড়লেন কোচে।

গুটার'স হিলের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ডোভার মেইল।

সকালে রয়্যাল জর্জ হোটেলে পৌঁছল ডোভার মেইল। হোটেল মালিক নিজেই এগিয়ে এল মিস্টার লরিকে দেখে। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। মিস্টার লরি টেলসন'স ব্যাংকের কর্ণধার। লন্ডন আর প্যারিসে তার বিশাল ব্যবসা। কাজেই লোক তিনি সামান্য নন। রয়্যাল জর্জ হোটেলে তাঁর খাতির একটু বেশিই।

'ক্যালাইসের কোনো জাহাজ আছে কাল?' জানতে চাইলেন মিস্টার লরি।

'আছে, স্যার', বলল হোটেল মালিক। 'যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। আপনার কি রুম লাগবে, স্যার?'

'লাগবে। তবে একটা নয়। দুটো। একটা মেয়ে আসার কথা আছে। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে। আমার খোঁজ করবে। অথবা টেলসন'স ব্যাংকের এক ভদ্রলোককে খুঁজতে পারে। ও এলে আমাকে জানাবেন।'

'জি, স্যার। চলুন আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

ঘণ্টাখানেক পর নিচে নামলেন মিস্টার লরি। ক্লিন শেভ্‌ড। পরনে বাদামি রঙের স্যুট। পায়ে চকচকে পালিশ করা জুতা। মোজার রঙও বাদামি। ষাট বছরের চৌকস এক ভদ্রলোকের মতোই লাগছে তাঁকে।

নাশতা সেরে আগুনের পাশে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বেলা একটু বাড়লে বেরিয়ে পড়লেন। সি বিচে হেঁটে বেড়ালেন। ওপারে ফরাসি উপকূল। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ঝাপসা দেখাচ্ছে। তাঁর স্মৃতির মতোই ঝাপসা। বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। আজ ফরাসি উপকূলের দিকে তাকিয়ে ছবির মতো একের পর এক মানসপটে ভেসে উঠছে সব। প্রায় পনের বছর আগে দুই বছরের একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ফরাসি দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই দুই বছরের শিশু আজ সতের বছরের তরুণী। আজ তাকেই আবার নিয়ে যেতে হবে ফরাসি দেশে। রয়্যাল জর্জ হোটেলে তারই পথ চেয়ে বসে রয়েছেন তিনি। কী বিচিত্র মানুষের জীবন!

ভাবতে ভাবতে হোটেলে ফিরলেন মিস্টার লরি। লাঞ্চ সারলেন। তারপর আবার বেরিয়ে পড়লেন। তবে এবার আর বিচে গেলেন না। সামুদ্রিক বন্দরটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। আরেকটি দিন বিলীন হল মহাকালের গর্ভে।

banglainternet.com

ধীর পায়ে হোটেলে ফিরলেন মিস্টার লরি। ডাইনিঙে ঢুকতে যাবেন এমন সময় এক ওয়েটার ছুটে এল কাছে। 'স্যার, মিস লুসি ম্যানেট নামে এক তরুণী এসেছে লন্ডন থেকে। আপনাকে খুঁজছে।'

'চল।' ওয়েটারের পেছন পেছন লুসির কামরার দিকে এগোলেন মিস্টার লরি।

বেশ বড়সড় ঘর। দুটো মোমবাতির কেঁপে কেঁপে ওঠা শিখা দূর করতে পারে নি অন্ধকার। কেমন যেন আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলা চলছে ঘরের ভেতর। হঠাৎ করে কিছুই দেখতে পেলেন না মিস্টার লরি। তারপর ফায়ার প্লেসের দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল তাঁর। ক্ষীণদেহী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। ছিপছিপে লম্বা। বেশ সুন্দরী। মাথায় এক রাশ সোনালি চুল। গায়ে তখনো ভ্রমণের পোশাক। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার লরি। বহুদিন আগে চ্যানেলের ওপার থেকে কোলে করে আনা একটা শিশুর মুখের সাথে মিল খুঁজছেন।

'বসুন, স্যার', হঠাৎ কথা বলে উঠল মেয়েটা। সামান্য বিদেশী টান রয়েছে উচ্চারণে।

সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে ছিলেন মিস্টার লরি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল মেয়েটার কথায়। একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

'গতকাল একটা চিঠি পেয়েছি টেলসন'স ব্যাংক থেকে', বলল লুসি ম্যানেট। 'তাতে বলা হয়েছে আমার মৃত বাবার কিছু বিষয়সম্পত্তির নাকি খোঁজ পাওয়া গেছে। সেগুলো বুঝে নেওয়ার জন্য আমাকে প্যারিস যেতে হবে। ব্যাংকের এক ভদ্রলোক যাবেন আমার সঙ্গে। তিনিই নাকি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'আমিই সেই ভদ্রলোক', বললেন মিস্টার লরি।

'ব্যাংককে আমি জানিয়ে দিয়েছি, আমি পিতৃ-মাতৃহীনা। আমার কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন নেই যাদের সঙ্গে আমি প্যারিস যেতে পারি। তাই ব্যাংকের সেই ভদ্রলোক যদি—'

'নিশ্চয়ই তুমি যাবে আমার সঙ্গে', বাধা দিয়ে বললেন মিস্টার লরি। 'চিঠিতে সেই কথাই বলা আছে। আর—'

'আর এ কথাও বলা আছে যে প্যারিসে গিয়ে কী কী করতে হবে তাও জানা যাবে আপনার কাছে। স্যার, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।'

'খুবই স্বাভাবিক', বললেন মিস্টার লরি। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। কীভাবে কথাটা শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু মিস্টার লরি কিছু বলার আগেই আবার বলে উঠল লুসি, 'আচ্ছা, আপনি কি আমার একেবারেই অপরিচিত?'

'তাই নই কি?' হেসে বললেন মিস্টার লরি। 'শোন লুসি, আমি ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসা দিয়েই শুরু করতে চাই। টেলসন'স ব্যাংকের এক মক্কেলের কথা তোমাকে শোনাব আজ। ঘটনাচক্রে আমরাও জড়িয়ে পড়েছি তার জীবনের কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে। সে কাহিনীই আজ শোনাব তোমাকে।'

'কাহিনী!' ভুরু কুঁচকে বলল লুসি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মিস্টার লরির দিকে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল পাশে।

'হ্যাঁ, লুসি। আমাদের সেই মক্কেল ছিল একজন ফরাসি ডাক্তার।'

'তিনি কি বোভেয়াবাসী?' অবাক হয়ে বলল লুসি।

'হ্যাঁ। তোমার বাবার মতো তিনিও ছিলেন একজন বোভেয়াবাসী। তোমার বাবার মতো তারও বেশ নামডাক ছিল প্যারিসে। আমি তখন প্যারিস শাখায় কাজ করি। সেখানেই ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয়। সেটা আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা।'

'কুড়ি বছর?'

'হ্যাঁ, লুসি। এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন ওই ডাক্তার। তাঁর বিষয়সম্পত্তির দেখাশোনার ভার ছিল টেলসন'স ব্যাংকের ওপর। এ নিছক ব্যবসায়িক সম্পর্ক।'

চমকে উঠল লুসি। 'এ তো আমার বাবার কাহিনী, স্যার। তা হলে আমার মা মারা যাবার পর আপনিই আমাকে নিয়ে এসেছিলেন লন্ডনে?'

'হ্যাঁ, লুসি। আমিই সেদিন নিয়ে এসেছিলাম তোমাকে। সেটাই ছিল আমাদের শেষ দেখা। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। এ কাহিনী তোমার বাবার জীবনের। তবে এতদিন তুমি জেনে এসেছ তোমার বাবা মারা গেছেন। কিন্তু এখন যদি শোন তিনি মারা যান নি, কেমন লাগবে তোমার?'

রক্তশূন্য হয়ে গেল লুসির মুখ। খামচে ধরল মিস্টার লরির দু বাহু। আঙুলগুলো কাঁপছে থরথর করে।

'শান্ত হও, লুসি', বললেন মিস্টার লরি। 'ধর তোমার বাবা মারা যান নি। মারা যাওয়ার বদলে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অথবা অতি ক্ষমতাধর কোনো শত্রু ভয়ঙ্কর কোনো জায়গায় বন্দি করে রেখেছিল তাঁকে। আর তাঁর স্ত্রী পাগলিনীর মতো দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে বেড়িয়েছে রাজার কাছে, রানীর কাছে, সমাজের প্রভাবশালীদের কাছে। যদি স্বামীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়! কিন্তু না। সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছে তার। এই যদি হয় তোমার বাবার কাহিনী তা হলে বলব সেই ডাক্তার আর তোমার বাবা একই ব্যক্তি।'

এ পর্যন্ত বলে একটু থামলেন মিস্টার লরি। লুসির মনটাকে শক্ত করার সময় দিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'তোমার মা তখন সন্তানসম্ভবা। স্বামী বেঁচে আছে না মরে গেছে সে খবরটুকু পর্যন্ত পেলেন না। কী এক অসহনীয় যন্ত্রণা। তোমার মায়ের সেই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জন্ম হল তোমার। কিন্তু তিনি সব সময়ই চাইতেন

banglainternet.com

মেয়ে যেন তাঁর মতো কষ্ট ভোগ না করে। মানুষের করুণার পাত্রী হয়ে বেঁচে না থাকে। এরই মধ্যে দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করল তাঁর। স্বামীর এই অন্তর্ধানের কষ্ট বেশিদিন সহ্য করতে পারলেন না তিনি। শেষে একদিন জগৎ সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর দিকে। তোমার বয়স তখন বছর দুয়েক।'

এটুকু বলে আবার থামলেন মিস্টার লরি। লক্ষ করলেন, অসহায় দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লুসি। কষ্ট পেলেন মিস্টার লরি। বুকের কোথায় যেন চিনচিন করে উঠল। কিন্তু তাই বলে তো থেমে থাকলে চলবে না। আবার শুরু করলেন তিনি, 'তবে তোমার মা ছিলেন বুদ্ধিমতী। মরবার আগে তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছেমতো টেলসন'স ব্যাংক দায়িত্ব নিল তোমার। আমি তোমাকে পৌঁছে দিলাম লন্ডনে। সেখানে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে তুমি দিনে দিনে বড় হতে লাগলে। তোমার মায়ের ইচ্ছেমতোই তোমাকে জানানো হল, তোমার বাবা মারা গেছেন তোমার জন্মের আগেই। এটা ছিল তোমার মায়ের একটা কৌশল। তুমি যদি জানতে পারতে তোমার বাবা বেঁচে আছেন, অথচ তাঁর কাছে যাবার উপায় নেই, তা হলে তোমাকেও তোমার মায়ের মতো এক অব্যক্ত কান্না বুকে চেপে বেঁচে থাকতে হত। সেই কষ্টের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যই তিনি এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এতদিন তুমি জানতে তোমার বাবা মৃত। কিন্তু না। বেঁচে আছেন তিনি। ক'দিন আগে খোঁজ পাওয়া গেছে ডাক্তার ম্যানেটের—মানে তোমার বাবার।'

'কোথায় আছেন তিনি?'

'আঠারটা বছর বাস্তিল কারাগারের এক অন্ধকার কুঠরিতে বন্দি ছিলেন তিনি। কিছু দিন আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁর এক পুরোনো কর্মচারীর বাড়িতে। সেখানেই যাব আমরা। শুনেছি শরীর-মন তাঁর ভেঙে গেছে। তবে বেঁচে আছেন এটাও তো কম কথা নয়। আমার দায়িত্ব হল তিনি সত্যিই তোমার বাবা কি না সেটা শনাক্ত করা। আর তোমার দায়িত্ব হল সেবা-যত্নে তাঁকে সুস্থ করে তোলা। স্নেহ-মমতায় তাঁর বিধ্বস্ত মনটাকে জাগিয়ে তোলা।'

সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল লুসির। যেন কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে ওর বাবাকে। আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল, 'বাবা, আমার বাবা। কত বছর পর দেখতে পাব তোমাকে।'

লুসির সোনালি চুলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মিস্টার লরি। কেমন যেন একটা গভীর স্নেহ ঝরে পড়ছে সেই দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাব তাঁকে। তবে একটা কথা, তোমার বাবাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে অন্য একটা নামে। হয়তো আসল নামটা তিনি ভুলে গেছেন। অথবা ইচ্ছে করেই লুকোতে চাইছেন। তবে যা-ই হোক, আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে তাঁকে নিরাপদে ফ্রান্স থেকে বের করে আনা। কাজটা করতে হবে খুবই গোপনে। কর্তৃপক্ষ টের পেলে সবাই বিপদে পড়ব। যদিও একজন ইংরেজ হিসেবে, টেলসন'স ব্যাংকের একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে ফ্রান্সে আমার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তবুও বাস্তিলের নাম মুখে আনতে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।'

স্থির হয়ে বসে ছিল লুসি। কিন্তু মিস্টার লরির কথা শুনতে শুনতে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তা বুঝতে পারেন নি তিনি। চোখ দুটো খোলা। সবই আগের মতো আছে। শুধু জ্ঞান নেই।

সাহায্যের জন্য হাঁকডাক শুরু করলেন মিস্টার লরি। পরক্ষণেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ইয়া মোটা এক মহিলা। পেছনে বয়-বেয়ারার দল। ঘরের ভেতর একনজর চোখ বুলিয়েই ঘুরে দাঁড়াল মহিলা। 'কী দেখছ হাঁ করে', সঙ্গে আসা লোকগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'দৌড়াও। স্মেলিং সল্ট নিয়ে এস। ঠাণ্ডা পানি আন। জলদি!'

মোটা মহিলা আসলে লুসির সার্বক্ষণিক সহচরী ও দাসী। নাম মিস প্রস। লুসির জ্ঞানহীন দেহটা শিশুর মতো কোলে তুলে নিল সে। আলতো করে শুইয়ে দিল একটা সোফায়। তারপর ফিরল মিস্টার লরির দিকে।

'এই যে মিস্টার', রাগতভাবে বলল সে, 'কী এমন ভয়ের কথা বললেন ওকে? ও তো মারা যেত আরেকটু হলে। দেখুন তো মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হাত-পা ঠাণ্ডা। এই বুদ্ধি নিয়ে ব্যাংক চালান কীভাবে?'

'না, মানে ভেবেছিলাম...' আমতা-আমতা করে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিস্টার লরি।

'থাক। আর সাফাই গাইতে হবে না।' লুসির মাথায় আদুরে হাত বুলাতে শুরু করল মিস প্রস।

চুপচাপ কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার লরি।

দুই

সেইন্ট আন্তোইন। প্যারিসের গরিব লোকদের বাস এখানে। এখানেই রয়েছে আর্নেস্ট দেফার্জের মদের দোকান। প্রকাণ্ড একটা মদের পিপে ভেঙে গেছে দোকানের সামনে। লাল মদের স্রোত বইছে রাস্তায়। গর্তগুলোকে মনে হচ্ছে যেন একেকটা

banglainternet.com

মদের চৌবাচ্চা। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই তা আকণ্ঠ পান করে নিচ্ছে। বিনে পয়সায় এই মদ খাওয়ার সুযোগ কে ছাড়ে! আঁজলা ভরে পান করছে কেউ। কেউবা মাটিতে শুয়ে পড়ে মুখ লাগিয়ে। কেউ পেয়ালা ভরে। কেউবা আবার রুমাল ভিজিয়ে নিংড়ে দিচ্ছে শিশুর মুখে। যে যেভাবে পারছে সাধ মিটিয়ে পান করে নিচ্ছে। একটা উৎসব চলছে যেন পাড়ায়। ছোটাছুটি, হাসাহাসির যেন বিরাম নেই। কেউ কেউ নাচতেও শুরু করেছে হাত ধরাধরি করে।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেফার্জ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পাড়ার লোকদের এই মাতামাতি। বড়ই গরিব এরা। হাড্ডিসার শরীর দেখেই বোঝা যায়, অর্ধাহারে দিন কাটে এদের। ভাগ্যবিড়ম্বিত লোকগুলোর বেঁচে থাকাটাই যেন একটা অভিশাপ। তবে আজ যেন আনন্দের কমতি নেই কারো। পিপে ভেঙেছে তো কী হয়েছে! এত বড় লোকসান দেখেও বিচলিত নয় দেফার্জ। বরং খুশিই হয়েছে। পাড়ার এই গরিবেরা একটু আনন্দ পায় যদি পাক না। পয়সা দিয়ে তো কিনে খাবার মতো অবস্থা নেই ওদের।

একসময় ফুরিয়ে গেল রাস্তায় পড়ে থাকা মদ। এক এক করে চলে গেল সবাই। থেমে গেল কোলাহল। দোকানের ভেতর ঢুকল দেফার্জ। গাট্টাগোট্টা শরীর তার। বয়স বছর ত্রিশেক। মাথায় কোঁকড়া চুল। বিশাল চওড়া বুক। কালো চোখ জোড়ায় অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার অদ্ভুত এক ক্ষমতা রয়েছে তার। কাউন্টারের পেছনে বসা মাদাম দেফার্জ। স্বামীর মতো তার চোখ দুটোও তীক্ষ্ণ, সতর্ক। একমনে সেলাই করে চলেছে। স্বামীকে দেখে খুক করে একবার কেশে উঠল সে। স্বামীর সাথে চোখাচোখি হতেই দোকানের কোণের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল। বুঝতে পারল দেফার্জ, অপরিচিত লোক এসেছে দোকানে। নইলে এমন অসময়ে কেশে উঠত না সে।

দোকানে বসা খদ্দেরদের মধ্যে দুজন ছাড়া সবাইকে চেনে দেফার্জ। এদের একজন বৃদ্ধ। আরেকজন অল্পবয়সী মেয়ে। তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে অন্য একটা টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। তিনজন লোক রয়েছে সেই টেবিলে। তিনজনের হাতেই মদের গ্লাস।

দেফার্জকে দেখে বলল একজন, 'কী খবর, জ্যাক? সবটুকু চেটেপুটে খেয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, জ্যাক', জবাব দিল দেফার্জ, 'এক ফোঁটাও নেই। একেবারে শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত চেটেপুটে খেয়েছে।'

'মদ তো বড় একটা পায় না ওরা', মন্তব্য করল দ্বিতীয় জ্যাক। 'কালো রুটি খেয়েই তো জীবন কাটে ওদের।'

'ঠিক বলেছ জ্যাক', বলল দেফার্জ।

'বড় কষ্টের জীবন ওদের', বলল তৃতীয় জ্যাক। 'যা হোক তবু মুখ বদলাবার একটা সুযোগ পেল আজ। তাও আবার বিনে পয়সায়। ঠিক বলি নি, জ্যাক?'

'একেবারে খাঁটি কথা', বলল দেফার্জ।

উঠে দাঁড়াল তিনজন। মদের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেল।

তিন-তিনবার একই নামের আদান-প্রদান মনোযোগ এড়ায় নি মাদাম দেফার্জের। প্রতিবারই ভুরু কুঁচকে উঠেছে তার। তবে সেলাইয়ের কাজ থেমে থাকে নি এক মুহূর্তের জন্য। মাথা নিচু করে চুপচাপ সেলাই করে চলেছে সে।

লোক তিনজন বেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন দেফার্জের কাছে।

'কিছু কথা আছে তোমার সাথে', বললেন বৃদ্ধ।

'আসুন', বলতে বলতে দরজার দিকে এগোল দেফার্জ।

খুব অল্প সময় কথা হল দুজনের। প্রথমে একটু চমকে উঠল দেফার্জ। পরে মনোযোগ দিয়ে শুনল সব। বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল। তারপর বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

মেয়েটাকে ডেকে বৃদ্ধও বেরিয়ে গেলেন দেফার্জের পেছন পেছন। তখনো আপনমনে সেলাই করে চলেছে মাদাম দেফার্জ। মনে হল কিছুই দেখতে পায় নি সে। কিছুই শুনতে পায় নি।

দরজা পেরিয়ে উঁচু দেয়ালঘেরা একটা উঠানে এলেন মিস্টার লরি আর লুসি। সেখানে বন্ধ একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেফার্জ। লুসি কাছে আসতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লুসির সামনে। লুসির একটা হাত ধরে ঠোঁটে ছোঁয়াল। বলল, 'আমাকে আপনি চিনবেন না, মিস ম্যানেট। ছেলেবেলায় আপনাদের বাড়িতে কাজ করতাম আমি। আপনার বাবা ভীষণ আদর করতেন আমাকে।'

'আমরা কেন এসেছি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়', বললেন মিস্টার লরি।

'হ্যাঁ, স্যার', উঠে দাঁড়িয়ে বলল দেফার্জ।

'এখন কি দেখা করা যাবে ডাক্তারের সাথে?'

'যাবে। চলুন।'

বন্ধ দরজাটা খুলল দেফার্জ। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

'উনি খুব বদলে গেছেন, তাই না?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'গেছেন মানে?' অস্বাভাবিক গলায় বলল দেফার্জ। দাঁতে দাঁত চেপে এক ঘুসি বসিয়ে দিল দেয়ালে।

বুঝতে বাকি রইল না মিস্টার লরির, ডাক্তার ম্যানেটের পরিণতিটা কী সাংঘাতিক।

banglainternet.com

মাঝখানে দুবার থামল তারা। বিশ্রাম নিল। অবশেষে উঠল শেষ মাথায়। পকেট থেকে চাবি বের করল দেফার্জ।

'উনাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয় নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'অনেকগুলো বছর তালাবন্ধ ঘরে কাটিয়েছেন কিনা তাই দরজা খোলা থাকলে ভয় পান। খেপে যান। আঁচড়ে-খামচে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেন।'

শেষ ধাপে উঠে বাঁয়ে ঘুরতেই চোখে পড়ল একটা বন্ধ দরজা। তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে কী যেন দেখছে। দেফার্জের সঙ্গে অপরিচিত লোক দেখে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল তারা। লোক তিনজনকে চিনতে পারলেন মিস্টার লরি। দোকানে দেখা সেই তিন জ্যাক।

'ডাক্তার ম্যানেট কি প্রদর্শনীর বস্তু নাকি?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন মিস্টার লরি। 'নাকি চিড়িয়াখানার জন্তু?'

'উনাকে দেখার জন্য বিশেষ কিছু লোক আসে এখানে', বলল দেফার্জ।

'বিশেষ মানে?'

'মানে যারা আমার মতো জ্যাক। উনাকে যারা ভালবাসে। ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আপনি ইংরেজ। ওসব বুঝবেন না।'

আর কথা বাড়াল না দেফার্জ। চাবি ঢোকাল তালায়। আস্তে আস্তে কপাট দুটো একটু ফাঁক করে উঁকি দিল ভেতরে। নিচু স্বরে কী যেন বলল। ক্ষীণ কণ্ঠে একটা জবাবও শোনা গেল। এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মিস্টার লরি আর লুসির দিকে। ইশারায় ডাকল, 'আসুন।'

লুসির হাত ধরে টানলেন মিস্টার লরি। কিন্তু নড়ল না লুসি। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'এস', অনুরোধ করলেন মিস্টার লরি।

'আমার ভয় করছে', বলল লুসি।

'কিসের ভয়?'

'বাবাকে।'

লুসির কাঁধে হাত রাখলেন মিস্টার লরি। 'পাগলী মেয়ে। বাবাকে কেউ ভয় পায়? এস আমার সাথে।' লুসিকে প্রায় টেনে ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

ছোট্ট ঘর। প্রায়ান্ধকার। জানালাটাও খুব ছোট। দুটো পাল্লার একটা বন্ধ। আরেকটা সামান্য খোলা। এক চিলতে আলো এসে পড়েছে ভেতরে। সেই আলোতেই দেখা গেল, দরজার দিকে পিঠ দিয়ে, একটা বেঞ্চের ওপর বসে আছে এক বৃদ্ধ। চুলগুলো বরফের মতো সাদা। আপনমনে জুতা সেলাই করছে।

'কেমন আছেন?' বৃদ্ধের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল দেফার্জ।

মুহূর্তের জন্য মাথাটা একটু উঁচু হল বৃদ্ধের। তারপর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল একটা ক্ষীণ শব্দ।

'ভালো।'

'এখনো কাজ করছেন দেখছি।'

অনেকক্ষণ পর আবার মাথা তুললেন বৃদ্ধ। আগের মতোই ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, করছি।' বলেই আবার মগ্ন হয়ে গেলেন কাজে।

'ঘরে আরেকটু আলো হলে অসুবিধা হবে আপনার?' বলল দেফার্জ। 'জানালাটা খুলে দিই?'

'কী বললে?'

'বলছিলাম আরেকটু আলো আপনি সহ্য করতে পারবেন কি না।'

'পারব।'

জানালাটা খুলে দিল দেফার্জ। আলোয় ভরে উঠল ঘর। এবার ভালো করে দেখা গেল বৃদ্ধকে। অর্ধেক সেলাই করা একটা জুতা কোলে বসে আছেন তিনি। সেলাইয়ের কিছু যন্ত্রপাতি আর কয়েক টুকরো চামড়া পড়ে আছে পায়ের কাছে। অনেক দিন এত আলো চোখে দেখেন নি। তাই একটা হাত আড়াল করে রেখেছেন চোখের ওপর। সাদা চুলের মতোই মুখে সাদা দাড়ি। যেমন-তেমন করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। গায়ে শতচ্ছিন্ন জামা। গলার কাছে খোলা। সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে হাড় জিরজিরে শরীর।

কাজ বন্ধ করে চুপচাপ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ। লক্ষ্যহীন দৃষ্টি।

'আপনি কি আজই জুতাজোড়া শেষ করতে চান?' জিজ্ঞেস করল দেফার্জ। সেইসাথে মিস্টার লরিকে ইশারা করল কাছে আসতে। লুসি দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

'কী বললে?'

'জুতাজোড়া কি আজই শেষ করতে চান?'

'কি জানি, করতেও পারি', মুখ না তুলেই বললেন বৃদ্ধ।

'আপনার কাছে একজন লোক এসেছে', বলল দেফার্জ। 'উনি জুতার কাজ খুব ভালো বোঝেন। জুতাজোড়া ভদ্রলোককে দেখান। ঠিক হচ্ছে কি না উনি বলতে পারবেন।' বলেই একপাটি জুতা তুলে দিলেন মিস্টার লরির হাতে। তারপর আবার ফিরল বৃদ্ধের দিকে। 'ভদ্রলোককে বলুন এটা কী ধরনের জুতা। আর যিনি বানাচ্ছেন তার নামটাও উনি জানতে চাইছেন।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'এটা মেয়েদের জুতা।'

'আর যিনি বানাচ্ছেন তার নাম?'

চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মনটা তার ভরে আছে আঁধারে। দীর্ঘদিনের জমাট আঁধার। দেফার্জের

banglainternet.com

কথাটা বিজলি চমকের মতো একবার চিরে দিয়ে গেল সেই আঁধার। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তলিয়ে যাচ্ছে জমাট অন্ধকারে। বুঝতে পারলেন মিস্টার লরি, সব ভুলে যাওয়া এই বৃদ্ধের মনে স্মৃতি জাগিয়ে তোলা কত শক্ত ব্যাপার।

কিন্তু যত শক্তই হোক, চেষ্টা করতে হবে তাদের। এগিয়ে এসে আবার বলল দেফার্জ, 'ভদ্রলোক আপনার নামটা জানতে চাইছেন।'

নীরব রইলেন বৃদ্ধ। আবার কিছুক্ষণ হাত বুলালেন দাড়িতে। তারপর কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'তুমি কি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম ওয়ান হানড্রেড অ্যান্ড ফাইভ, নর্থ টাওয়ার।' বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। আবার ডুবে গেলেন কাজে।

কিন্তু এ যেন দীর্ঘশ্বাস নয়। কাতর কোনো উক্তিও নয়। তার দেহ-মন যে দারুণ ক্লান্তির ভারে ভেঙে পড়েছে, তারই এতটুকুন বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আবার তার মনোযোগ ভঙ্গ হল। তবে এবার দেফার্জের কথায় নয়। প্রশ্ন করলেন মিস্টার লরি। 'জুতা তৈরি আপনার আসল পেশা নয়, তাই না?' কোটরগত ঘোলাটে চোখ তুলে প্রথমে দেফার্জের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। তারপর মিস্টার লরির দিকে।

'না জুতা তৈরি আমার পেশা নয়। কারাগারে বসে নিজে নিজেই শিখেছি। চুপচাপ সময় কাটত না। খারাপ লাগত। অনেক কষ্টে কারা-কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়েছিলাম। সেই থেকে জুতা বানাচ্ছি।'

মিস্টার লরির দিকে হাত বাড়ালেন বৃদ্ধ। জুতাটা ফেরত দিলেন মিস্টার লরি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধের মুখের দিকে।

'মঁসিয়ে ম্যানেট, আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন না?'

কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধ। জুতাটা পড়ে গেল হাত থেকে। অপলক তাকিয়ে রইলেন প্রশ্নকর্তার দিকে।

'সত্যি কি আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, ডাক্তার ম্যানেট? পুরোনো দিনের কথা কিছুই কি মনে পড়ে না আপনার? আমি জারভিস লরি। আপনার পুরোনো ব্যাংকার।'

একবার মিস্টার লরির দিকে আরেকবার দেফার্জের দিকে তাকাতে লাগলেন ডাক্তার ম্যানেট। মুখটা কেমন যেন একটু উজ্জ্বল মনে হল দীর্ঘদিনের নির্জন কারাবন্দির। যে কালো কুয়াশার পরদা বহু বছর ধরে তাঁর স্মৃতিকে আড়াল করে রেখেছিল, তা যেন হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য একটু ফাঁক হল। মুহূর্তের জন্য চকিত দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠল। তারপর আবার সেই অন্ধকার। ম্লান হয়ে গেল সব। পড়ে যাওয়া জুতাটা তুলে আবার কাজ শুরু করলেন।

'আপনি কি উনাকে চিনতে পেরেছেন?' মিস্টার লরির কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল দেফার্জ।

'হ্যাঁ, পেরেছি', বললেন মিস্টার লরি। ইনিই ডাক্তার ম্যানেট। দেফার্জকে টেনে একপাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

ধীরে ধীরে দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এল লুসি। নিঃশব্দে বেঞ্চটার পাশে এসে দাঁড়াল। কিছুই খেয়াল করলেন না বৃদ্ধ। আগের মতোই ঘাড় গুঁজে কাজ করতে লাগলেন। লুসিও দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বেশ কিছুক্ষণ পর চামড়া কাটার ছুরির দরকার হল বৃদ্ধের। ঝুঁকে মেজে থেকে ছুরিটা তুলতে যাবেন এমন সময় চোখ পড়ল লুসির স্কার্টের ওপর। চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। হাতে ছুরি নিয়ে চোখ তুলে তাকালেন লুসির দিকে।

'কে তুমি? কারাপ্রধানের মেয়ে?'

'না', দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল লুসি।

'তা হলে কে?'

কথা বলার শক্তি যেন লোপ পেয়েছে লুসির। আবেগে কাঁপছে সারা শরীর। কোনো জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে বসে পড়ল বাবার পাশে। ভয়ে, সঙ্কোচে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ। লুসিও সরে এসে একটা হাত চেপে ধরল তাঁর। এবার আর সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না বৃদ্ধ। বিস্ময় আর কৌতূহল-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লুসির মুখের দিকে। সোনালি এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে লুসির কাঁধের ওপর। একটু একটু করে বৃদ্ধের হাত এগিয়ে গেল সেই দিকে। এক গোছা চুল তুলে নিলেন হাতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করলেন। তারপর নিজের গলা থেকে সুতোয় বাঁধা নোংরা একটা পুঁটুলি খুলে আনলেন। ধীরে ধীরে মুখ খুললেন পুঁটুলির। কয়েক গাছি সোনালি চুল বেরুল ভেতর থেকে। লুসির চুলের মতোই মসৃণ, চিকন।

একবার নিজের হাতে ধরা চুল আরেকবার লুসির চুলের দিকে তাকাতে লাগলেন বৃদ্ধ। বার কয়েক করলেন এ রকম। তারপর বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুবহু একই রকম। এ কী করে সম্ভব! কে তুমি?'

বৃদ্ধের উৎকণ্ঠিত গলা শুনে চমকে উঠলেন মিস্টার লরি আর দেফার্জ। দ্রুত পা বাড়ালেন বৃদ্ধের দিকে।

'প্লিজ, আসবেন না এদিকে', হাত তুলে বাধা দিল লুসি। 'কথা বলবেন না।'

'এ কার গলা!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ। 'কে তুমি?'

দু হাতে বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে ধরল লুসি। 'সব বলব। আমি কে, আমার বাবা কে, মা কে, সব বলব। কিন্তু এখন নয়। আগে তোমাকে ইংল্যান্ড নিয়ে যাই। তারপর বলব।'

লুসির কাঁধে মাথা এলিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। চোখ মুদে এল ধীরে ধীরে।

BanglaInternet.com

'এক্ষুনি উনাকে প্যারিস থেকে নিয়ে যাওয়া দরকার', বলল লুসি।

'এই দুর্বল শরীরে কি পথের ধকল সইতে পাইবে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'না পারলেও যেতে হবে', বলল দেফার্জ। 'প্যারিসে থাকা এক মুহূর্তও নিরাপদ নয় উনার জন্য। আমি কি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করব?'

'চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।'

লন্ডন যাবার সব আয়োজন শেষ করে ফিরে এলেন মিস্টার লরি আর দেফার্জ। ডাক্তার ম্যানেটকে খাওয়ানো হল। নতুন জামা-কাপড় পরানো হল। তারপর রওনা হল সবাই। ততক্ষণ অন্ধকার গ্রাস করেছে চারপাশ।

কোচোয়ানকে আগেই বলা-কওয়া ছিল। সবাই ওঠামাত্র ছেড়ে দিল কোচ। রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে ছুটে চলল সীমান্তের দিকে।

কিন্তু নগর-তোরণের কাছে আসতেই বিপত্তি ঘটাল এক সৈনিক। হাতের লণ্ঠন দুলিয়ে কোচ থামার নির্দেশ দিল সে।

'আপনাদের পরিচয়পত্র দেখান।'

কোচ থেকে নেমে পড়ল দেফার্জ। কাগজপত্র দেখাল সৈনিককে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল। সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সৈনিক। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যেতে পারেন আপনারা।'

উপকূলের দিকে এগিয়ে চলল কোচ। আর দেফার্জ রওনা হল শহরের দিকে।

তিন

পাঁচ বছর পর।

ওল্ড বেইলি। লন্ডনের ফৌজদারি আদালত। চাঞ্চল্যকর একটা মামলার শুনানি চলছে সেখানে। অসম্ভব ভিড়। চারপাশে একটা চাপা গুঞ্জন।

বিচারক আর জুরিরা ঢুকতেই থেমে গেল সব গুঞ্জন। আর কিছুক্ষণ পর আসামিকে আনা হল কাঠগড়ায়। বছর পঁচিশের মতো বয়স। স্বাস্থ্যবান। সুদর্শন। লম্বা কালো চুলগুলো মাথার পেছনে রিবন দিয়ে বাঁধা। প্রথম দর্শনে ভদ্রলোক বলেই মনে হল। যদিও বর্তমান বিপদের জন্য মুখটা বিবর্ণ। কিন্তু কোনো রকম চাঞ্চল্য নেই তার ভেতর। বেশ শান্ত, সংযতভাবেই অভিবাদন জানাল বিচারককে। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কাঠগড়ার রেলিং ধরে।

আসামির উকিলের সামনে একগাদা কাগজপত্র। ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছে। তার উলটোদিকে বসা আরো একজন উকিল। বয়সে তরুণ। বসে বসে ছাদের কড়িকাঠ গুনছে।

নিঃশব্দ আদালত কক্ষ। আসামি চার্লস ডারনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পড়ে শোনাচ্ছেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

'গতকাল আসামি চার্লসকে আদালতে হাজির করা হলে সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, সে ফ্রান্সের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে। এজন্যই তাকে বেশ কিছু দিন যাবৎ ঘন ঘন ইংলিশ চ্যানেল পারাপার হতে দেখা গেছে। কী এত প্রয়োজন তার ফ্রান্সে? এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে। ইংল্যান্ডের রাজা আমেরিকা এবং কানাডায় পাঠানোর জন্য যেসব বাহিনী প্রস্তুত করছেন তাতে কত সৈন্য আছে, তারা কোথায় অবস্থান করছে, কী কী অস্ত্রে শিক্ষালাভ করছে—এইসব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করে ফ্রান্সের রাজার কাছে পাচার করাই তার পেশা।' এ পর্যন্ত বলে একটু থামলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

নিঃশব্দে সব শুনল চার্লস ডারনে। অভিযোগ গুরুতর। কিন্তু এজন্য কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না তার মধ্যে। শুধু মাথা তুলে দৃষ্টি বুলাতে লাগল আদালত কক্ষের চারপাশে। হঠাৎ একটা জায়গায় থমকে গেল তার দৃষ্টি। চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। রক্ত সরে গেল মুখের। কামরার প্রতিটা লোক লক্ষ করল তার এই ভাবান্তর। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘুরে দাঁড়াল সবাই।

কক্ষের বাঁ দিকে বসে রয়েছে এক তরুণী। মাথায় সোনালি চুল। বিশের কিছু ওপরে হবে বয়স। তরুণীর পাশেই এক ভদ্রলোক। মাথার চুল সব সাদা। ভদ্রলোকের একটা বাহু ধরে রেখেছে মেয়েটা।

আবার শুরু করলেন অ্যাটর্নি জেনারেল, 'মাননীয় আদালত, আসামির বয়স কম হলেও সে একজন ধূর্ত প্রকৃতির লোক। তার বক্তব্য হল সে ব্যক্তিগত কাজে ঘন ঘন ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু ব্যক্তিগত কাজটা যে কী, তা সে ব্যাখ্যা করে নি। আমরাও বুঝে উঠতে পারি নি। আমাদের মতো আসামির এককালের বন্ধু জন বরসাদ এবং রক্ষার ক্লাইও প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। হঠাৎ একদিন আসামির কোটের পকেটে কিছু কাগজপত্র পেয়ে আবিষ্কার করে তার ঘন ঘন যাওয়া-আসার রহস্য। দেশপ্রেমের তাগিদে আজ তারা আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছে। ওইসব কাগজপত্রে রয়েছে ইংল্যান্ডের রাজকীয় নৌবহর ও স্থলবাহিনীর অবস্থানের বিস্তারিত

banglainternet.com

বিবরণ। যা আগেই মাননীয় আদালতে পেশ করা হয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, তালিকাটি আসামির নিজের হাতে লেখা নয়। তাতে আসামির নির্দোষিতা প্রমাণ হয় না। এখানেও আসামি তার ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করেই লেখাগুলো সে অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে বলে আমার ধারণা।

'তাই মাননীয় আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা, আসামির এই জঘন্য অপরাধের কথা বিবেচনা করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হোক এবং চরম শাস্তি দিয়ে তার অশুভ তৎপরতার চিরসমাপ্তি ঘটানো হোক।'

নিজের আসনে বসলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। জন বরসাদকে ডাকা হল সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল বরসাদ। চার্লস ডারনের উকিল মিস্টার স্ট্রাইভার উঠে দাঁড়াল তাকে জেরা করার জন্য।

'মিস্টার বরসাদ, তুমি কখনো গুপ্তচর ছিলে?'

'না।'

'তোমার দিন চলে কীভাবে?'

'উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কিছু সম্পত্তি আছে।'

'কার কাছ থেকে পেয়েছিলে?'

'দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের কাছ থেকে।'

'তার নাম?'

'নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।'

'জেলে গিয়েছ কখনো?'

'অবশ্যই না।'

'দেনার দায়েও না? মনে করে দেখ তো।'

'বুঝতে পারছি না, এই মামলার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। দেনার দায়েও জেলে যাও নি কখনো?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'ক'বার?'

'দু' তিনবার।'

'নাকি পাঁচ-ছ'বার।'

'হতে পারে। মনে নেই।'

'জুয়া খেলেছ কখনো?'

'খেলেছি।'

'লাথি খেয়েছ কখনো? লাথি মেরে ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল কেউ?'

'একবার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আচমকা আমার এক বন্ধু এসে লাথি মারে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাই।'

'যদি বলি জুয়া খেলার সময় জোচ্চুরি করার জন্য লাথি খেয়েছিলে?'

'মিথ্যে কথা। লোকটা মাতাল ছিল।'

'এবার বল তো আসামিকে তুমি চেন?'

'হ্যাঁ।'

'ও তোমার বন্ধু ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কখনো টাকা ধার করেছিলে ওর কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'শোধ দিয়েছ?'

'না।'

'আমার মনে হয় আসামিকে তুমি চিনতে পার নি। অন্য কাউকে আসামি বলে ভুল করেছ।'

'না।'

'আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা খেয়েছ। তাদের শেখানো মতে মিথ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছ।'

'না', জোর প্রতিবাদ জানাল বরসাদ। 'কক্ষনো নয়।'

'ঠিক আছে। তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

নেমে গেল জন বরসাদ। পরবর্তী সাক্ষী রজার ক্লাই উঠল কাঠগড়ায়। শপথ নিল। স্ট্রাইভারের জেরার জবাবে সে যা জানাল তার সারমর্ম হল : চার বছর আগে সে আসামির বাড়িতে কাজ নেয়। কিছু দিন পরই আসামির গতিবিধির ওপর তার সন্দেহ হয়। একদিন কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখার সময় একটা তালিকা পায় আসামির পকেটে। ক্যালাইস বন্দরে এক ফরাসিকে এমনই একটা তালিকা দিয়েছিল আসামি। সে যখন বুঝতে পারল তার মনিব একজন দেশদ্রোহী তখন আর তার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। দেশপ্রেমের তাগিদে সব জানিয়ে দিল সরকারকে। রজার ক্লাই আরো জানায় যে, জন বরসাদের সঙ্গে আসামির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল তারা। জেরার মুখে ক্লাই আরো জানায়, চুরির দায়ে সে নিজেও একবার জেলে গিয়েছিল।

তৃতীয় সাক্ষী মিস্টার জারভিস লরি। তাকে জেরা করার জন্য আদালতের কাছে অনুমতি চাইলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। অনুমতি দেওয়া হল।

'আপনি মিস্টার জারভিস লরি?'

'হ্যাঁ।'

'টেলসন'স ব্যাংকে চাকরি করেন?'

'হ্যাঁ।'

banglainternet.com

'আসামিকে আগে কখনো দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'কত দিন আগে?'

'বছর পাঁচেক। আমি তখন ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড আসছিলাম। উনিও ছিলেন জাহাজে।'

'ক'টার সময় উনি জাহাজে ওঠেন?'

'মাঝরাতের কিছু পর।'

'আপনি কি একা ছিলেন?'

'না। আরো দুজন ছিল আমার সঙ্গে। এক ভদ্রলোক। আর এক তরুণী। তাঁরা এখন আদালতে উপস্থিত আছেন।'

'আসামির সাথে কোনো কথা হয়েছিল আপনার?'

'না হওয়ার মতোই। বিশেষ কিছু না। আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল সেদিন। আমি একটা সোফার ওপর কাত হয়ে পড়েছিলাম। কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না কারো।'

'ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।'

এর পর লুসি ম্যানেট এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

'মিস ম্যানেট', জেরা শুরু করলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। 'তোমার আগের সাক্ষী যে তরুণীর কথা বললেন সে কি তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো আসামিকে আগে কখনো দেখেছ কি না?'

'দেখেছি।'

'কোথায়?'

'এইমাত্র আগের সাক্ষী যে স্টিমারের কথা বললেন সেই স্টিমারে।'

'আসামির সঙ্গে কোনো কথা হয়েছিল তোমার?'

'হয়েছিল।'

'কী কথা?'

'ভদ্রলোক যখন জাহাজে এলেন—'

'ভদ্রলোক মানে আসামি?' জিজ্ঞেস করলেন বিচারক।

'হ্যাঁ, স্যার?'

'তা হলে বল আসামি।' সংশোধন করে দিলেন বিচারক।

'আসামি যখন জাহাজে ওঠেন তখন আবহাওয়া ছিল খুব খারাপ। ঝড়ের বেগে বাতাস বইছিল। বাবাও ছিলেন শারীরিকভাবে খুব দুর্বল। ঠাণ্ডায় কাঁপছিলেন। তাঁকে সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছিলাম আমি। তখন উনিই আমার উপকার করেছিলেন। বাবাকে কোথায় কীভাবে রাখলে শরীরে বাতাস কম লাগবে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন আমায়। বাবাকে ধরে খোলা জায়গা থেকে আড়ালে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।'

'আসামি কি একা ছিল?'

'না। আরো দুজন ফরাসি ভদ্রলোক ছিলেন উনার সঙ্গে।'

'কোনো কাগজপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল তাদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। তবে কী ধরনের কাগজ তা জানি না।'

'আসামি তোমাকে কী বলেছিল?'

'বলেছিলেন বিশেষ একটা কাজে লন্ডন যাচ্ছেন। কাজটা খুবই গোপনীয় এবং বিপজ্জনক। ফাঁস হয়ে গেলে অনেক লোক বিপদে পড়ে যাবে। তাই উনি ছদ্মনামে ভ্রমণ করছেন।' এ পর্যন্ত বলেই ফুঁপিয়ে উঠল লুসি। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'একদিন উনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। বিশ্বাস করে কথাগুলো বলেছিলেন। তার সেই বিশ্বাসের প্রতিদান আজ এভাবে দিতে হবে ভাবতেও পারি নি।'

সত্যি ভাবতে পারে নি লুসি, একদিন চার্লসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে। চার্লস যে রকম ভদ্র ব্যবহার করেছিল তাতে কৃতজ্ঞ হয়েই আছে ও। অথচ সত্যের খাতিরে আজ যে কথা বলতে হচ্ছে, তা হয়তো চার্লসের বিরুদ্ধেই যাবে। হয়তো মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। আর তা-ই যদি হয় তা হলে কিছুটা হলেও নিজেকে দায়ী মনে করবে ও।

'মিস ম্যানেট', কঠোর স্বরে বলে উঠলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। 'আদালতে কোনো ভাবাবেগের মূল্য নেই। সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই জজ-জুরিরা তাদের রায় দেবেন। তোমার কর্তব্য হল আদালতকে সত্য কথা জানানো।'

'জি।'

'এবং এ পর্যন্ত যা বললে সবই সত্যি বলেছ?'

'জি।'

'ঠিক আছে। আর কিছু বলতে হবে না তোমাকে।'

ডাক্তার ম্যানেটের ডাক পড়ল এবার। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলেন তিনি। শপথ নিলেন।

জেরা শুরু করলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। 'আসামিকে আগে কখনো দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। মাত্র একবার। বছর তিনেক আগে। আমার লন্ডনের বাসায়।'

'আসামি কি আপনার সঙ্গে একই জাহাজে ফ্রান্স থেকে লন্ডন আসছিল?'

'বলতে পারব না।'

'না পারার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি?'

banglainternet.com

'তখন আমি শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম। কোনো কিছুই মনে নেই।'

'আপনার সেই অসুস্থতার কারণ কি বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারাবাস?'

'হতে পারে।'

'আপনি কি তখন সবে মুক্তি পেয়েছেন?'

'ওদের কাছে তাই শুনেছি। কারাগারে যাওয়ার কিছু দিন পরই আমার স্মৃতি লোপ পায়। তারপর লন্ডনে মেয়ের কাছে যাবার আগ পর্যন্ত কিছুই মনে নেই।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার ম্যানেট। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমার।'

শেষ সাক্ষীকে ডাকা হল এবার। অ্যাটর্নি জেনারেলের জেরার জবাবে সে জানাল, আসামিকে বছরখানেক আগে একটা সেনানিবাসের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছিল। আরো কয়েকজন সন্দেহভাজন লোক ছিল তার সঙ্গে। সম্ভবত সেনানিবাসের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করছিল তারা। জেরার জবাবে আরো জানাল, জীবনে একবারই এই আসামিকে দেখেছে সে। কিন্তু এই আসামিই যে সেই ব্যক্তি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার। লোকটা নিশ্চয়ই ফরাসি গুপ্তচর।

শেষ সাক্ষীর বক্তব্য শুনে হাসি ফুটে উঠল অ্যাটর্নি জেনারেলের মুখে। আর আসামির উকিল মিস্টার স্ট্রাইভারের কপালে দেখা গেল চিন্তার রেখা। সাক্ষীকে জেরা শুরু করলেন তিনি। অনেকভাবে ঘুরিয়েফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। কিন্তু এমন একটা কথাও বের করতে পারলেন না সাক্ষীর পেট থেকে যা তার মক্কেলের পক্ষে যায়। এ সাক্ষী সত্যিই বিপদ ঘটাবে, ভাবলেন তিনি। মক্কেলকে বুঝি আর বাঁচানো গেল না। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল আদালত কক্ষে।

সেই তরুণ আইনজীবী, যে এতক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সে। এক টুকরো কাগজে খসখস করে কী যেন লিখল। তারপর দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল মিস্টার স্ট্রাইভারের দিকে।

কাগজটা পড়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মিস্টার স্ট্রাইভার। তারপর কৌতূহল-ভরা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন একবার মক্কেলের দিকে, আরেকবার সেই পত্রলেখক উকিল বন্ধু সিডনি কারটনের দিকে।

আবার সাক্ষীর দিকে ফিরলেন তিনি।

'তুমি কি নিশ্চিত যে এই আসামিকেই দেখেছিলে?'

'এক শ ভাগ নিশ্চিত।'

'আসামির চেহারার সাথে মিল আছে এমন কাউকে দেখ নি তো?'

'না।'

'ভেবে বল।'

'ভেবেই বলছি।'

'ঠিক আছে। এবার আমার ওই উকিল বন্ধুর দিকে তাকাও তো দেখি।' সিডনি কারটনের দিকে ইশারা করে বললেন মিস্টার স্ট্রাইভার। 'কী মনে হচ্ছে? হুবহু মিল আছে দু-জনের চেহারায়?'

অবাক দৃষ্টিতে সিডনি কারটনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সাক্ষী। শুধু সাক্ষী কেন। জজ, জুরি এমনকি আদালতসুদ্ধ সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। বিচারকের নির্দেশে কারটন যখন উঠে দাঁড়াল এবং মাথার পরচুলা খুলে ফেলল তখন সাদৃশ্যটা আরো প্রকট হল। অদ্ভুত মিল দুজনের চেহারায়। ওরা কি যমজ ভাই নাকি? গুঞ্জন উঠল আদালত কক্ষে।

'তুমি কি এখনো বলতে চাও যে সেদিন আসামিকেই দেখেছিলে সেনানিবাসের কাছে?' সাক্ষীকে আবার জেরা শুরু করলেন মিস্টার স্ট্রাইভার।

'না...মানে...' দ্বিধার সঙ্গে কী যেন বলতে যাচ্ছিল সাক্ষী।

'থাক, আর কিছু বলতে হবে না তোমাকে।' বিচারকের দিকে ফিরলেন মিস্টার স্ট্রাইভার। 'মাই লর্ড, এখন তা হলে সিডনি কারটনকেও গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত করা উচিত।'

বুঝতে পারল সবাই, আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা কিছু ছিল তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন মিস্টার স্ট্রাইভার। দুজনের চেহারার এই অদ্ভুত মিল পুরো মামলাটিকেই বানচাল করে দিতে বসেছে।

'মাই লর্ড', খানিক বিরতির পর আবার শুরু করলেন মিস্টার স্ট্রাইভার। 'বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে এই মামলা সম্পর্কে আমার যা ধারণা হয়েছে তা হল, জন বরসাদ একজন তাড়াটে গুপ্তচর। আর আসামির এককালের ভৃত্য রজার ক্লাই তার সহযোগী। এই দুজন মিলে একজোট হয়ে আসামির বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকে দিয়েছে। সম্ভবত জুয়া খেলার জন্য চার্লসের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল বরসাদ। সেই টাকা যাতে কোনোদিন শোধ দিতে না হয় সেজন্যই একটা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে ওর বিরুদ্ধে। আমার মক্কেল ঘন ঘন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যাতায়াত করত ঠিকই, তবে তা ছিল পারিবারিক কারণে। আমার আর কিছু বলার নেই, মাই লর্ড।'

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে বসলেন মিস্টার স্ট্রাইভার।

অ্যাটর্নি জেনারেলের দিকে তাকালেন বিচারক। 'আপনার কি আর কিছু বলার আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

উঠে দাঁড়ালেন অ্যাটর্নি জেনারেল। সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। আসামি দেশের শত্রু, রাজার শত্রু। সুতরাং তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

দু পক্ষের সমাপনী বক্তব্য শেষ। এবার রায়ের পালা। সিডনি কারটনকে অভিযুক্ত করার অভিসন্ধি জুরিদের কারোই ছিল না। কিন্তু চার্লসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-

banglainternet.com

প্রমাণ যা ছিল তাও মিস্টার স্ট্রাইভের ধারালো যুক্তিতর্কের কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অনেক তর্কবিতর্কের পর জুরিরা রায় দিতে বাধ্য হলেন, 'আসামিকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করার মতো জোরালো প্রমাণ কিছুই পাওয়া গেল না। তাই তাকে মুক্তি দেওয়া হল।'

মুক্ত হল চার্লস ডারনে। সিডনি কারটনের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে রইল।

চার

ফ্রান্স।

মার্কুইস অব এভরেমঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপ আর ক্ষমতার কথা ফরাসিবাসীর অজানা নয়। মার্কুইসরা রাজা নন। তবে রাজার ঠিক নিচেই তাঁদের স্থান। তাঁরাও থাকেন রাজপ্রাসাদে। নিজের এলাকায় হাজার হাজার লোকের দণ্ডমুণ্ডের মালিক তাঁরা।

মার্কুইস অব এভরেমঁদের বয়স ষাট। এই বয়সেও দেখতে সুদর্শন। আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে একটা উদ্ধত ভাব ফুটে থাকে সব সময়। হালফ্যাশনের কেতাদুরস্ত পোশাক পরতে ভালবাসেন। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে ঘুঘু রঙের রাজকীয় পোশাক। তাতে সোনালি সুতোর লেস লাগানো। কোটের নিচে সাদা ব্রোকেডের জামা। বোতামগুলো স্বর্ণখচিত। আস্তিনের কবজির কাছে সিল্কের কুঁচি। পায়ে সিল্কের মোজা। হাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে মহামূল্যবান আংটি।

মার্কুইসদের খাওয়াদাওয়া চলে রাজকীয় আড়ম্বরে। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস চকোলেট পান করেন তিনি। চারজন সুদক্ষ ভৃত্যের দরকার হয় এজন্য। একজন কম হলেও চলবে না। মার্কুইস তাতে অবহেলিত, অপমানিত বোধ করেন। একজন নিয়ে আসবে চকোলেটের স্বর্ণপাত্র। দ্বিতীয়জন কাঠি দিয়ে নাড়বে সেই চকোলেট। তৃতীয়জন রেশমি কাপড় দিয়ে ঢাকা দেবে তাঁর অঙ্গ। যাতে চকোলেটের ছিটেফোঁটা লেগে না যায় তাঁর মূল্যবান পোশাকে। চতুর্থজন চকোলেট ঢেলে দেবে সোনার পেয়ালায়। তবেই তা পানযোগ্য হবে।

একদিন এই মার্কুইস অব এভরেমঁদ এলেন রাজার কাছে। সারি সারি ঘর রাজপ্রাসাদে। মহামূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত। প্রতিটি ঘরেই অভ্যাগতদের ভিড়। দলে দলে সারিবদ্ধ হয়ে বসে রয়েছে একটিবার রাজ-দর্শন পাবার জন্য। তাদের আরজি জানাবার জন্য। কিন্তু এত আরজি শোনার সময় কোথায় রাজার? বঞ্চিত ফরাসি জাতির জন্য তাঁর যত না ভাবনা তার চেয়ে বেশি ভাবনা নিজের আরাম-আয়েশের জন্য, তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে ভোগবিলাসে, শিকারে আর নাট্যশালায়। দেশের কথা ভাববার এত সময় কোথায় তাঁর? দেশ রসাতলে গেলেই-বা ক্ষতি কী?

অবশেষে খুলে গেল রুদ্ধ দ্বার। রাজাবেশী প্রভুর উদয় হল অভ্যাগতদের সামনে। ডানে-বাঁয়ে নুয়ে পড়তে লাগল সারিবদ্ধ মাথা। পড়তেই হবে। এটা যে রাজার বিধান। নইলে ঘাড়ের মাথা মাটিতে লুটিয়ে দেবে দেহরক্ষীরা।

কারো দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসি, কাউকে একটি কথা, কারো পানে একটু আড়চোখে দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে এগিয়ে চললেন তিনি। কক্ষের পর কক্ষ পেরিয়ে চলে গেলেন উঠানে।

দরবার কক্ষে একা বসে রয়েছেন মার্কুইস। তাঁর আগমনের খবর আগেই জানানো হয়েছে রাজাকে। তিনি যে এখন দরবার কক্ষে বসে রয়েছেন তাও রাজা জানেন। তারপরও তাঁকে দর্শন না দেওয়ায় অপমানিত বোধ করলেন মার্কুইস। রাগে গজগজ করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, রাজা হন নি তো কী হয়েছে? রাজার অসীম প্রতাপ আর ক্ষমতা তো পরিচালিত হয় তাঁদের হাত দিয়েই। বঞ্চিত ফরাসিদের কাছে তাঁরাও কম বড় প্রভু নন।

প্রস্তুত হয়েই ছিল ঘোড়ার গাড়ি। দুই বেয়ারা এসে খুলে ধরল দরজা। উঠে বসলেন। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল গাড়ি।

জনাকীর্ণ রাজপথ। এত বেগে গাড়ি চালানো নিরাপদ নয়। তবু চাবুকের পর চাবুক হাঁকাচ্ছে কোচোয়ান। বিপজ্জনকভাবে মোড় ঘুরছে। মহিলারা আতঙ্কে চিৎকার করে সরে যাচ্ছে। পুরুষেরা সরিয়ে নিচ্ছে বাচ্চাদের। তাদের প্রাণ বাঁচানো তাদেরই কাজ। কোনো হতভাগা যদি চাপা পড়ে যায় এজন্য ঘোড়ার কোনো দোষ নেই। কোচোয়ানের তো নয়ই। এই না হলে মার্কুইসের গাড়ি!

একটা ঝরনার কাছে ভয়ানক ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে দাঁড়াল গাড়ি। একটা চাকা ধাক্কা খেয়েছে কিসের সঙ্গে যেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিশুর আর্ত চিৎকার। সামনের পা তুলে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াগুলো।

ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠল বলেই গাড়ি থেমে দাঁড়াল। নইলে থামবে কেন! গাড়ির তলায় কত মানুষই চাপা পড়ে থাকে। তাই বলে মার্কুইসের গাড়ি রাস্তার মাঝখানে থেমে দাঁড়াবে এমন আশা কেউ করতে পারে না। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্মিলিত চিৎকার। বেশ কিছু লোক আঁকড়ে ধরেছে ঘোড়ার লাগাম।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন মার্কুইস। 'কী হয়েছে?'

banglainternet.com

ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে একটা মাংসপিণ্ড বের করে আনল লম্বা একটা লোক। ঝরনার পাশে পিণ্ডটা রেখে, তার ওপর ঝুঁকে পড়ে হাউমাউ করে উঠল।

'মাফ করবেন, মঁসিয়ে দ্য মার্কুইস', ছেঁড়া কাপড় পরা হাড় জিরজিরে এক লোক বলে উঠল, 'আপনার গাড়ির নিচে একটা বাচ্চা চাপা পড়েছে।'

'ওই লোকটা অমন জানোয়ারের মতো চেঁচাচ্ছে কেন? ওর বাচ্চা নাকি?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে দ্য মার্কুইস।'

হঠাৎ মাংসপিণ্ডের ওপর থেকে লাফিয়ে উঠল লোকটা। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল গাড়ির দিকে। দুই হাত মাথার ওপর তুলে চিৎকার করতে লাগল, 'মেরে ফেলেছে। আমার সোনা মানিককে মেরে ফেলেছে।'

এরই মধ্যে গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে বিক্ষুব্ধ লোকজন। চোখে তাদের প্রতিহিংসার আগুন। ভস্ম করা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মার্কুইসের দিকে।

দ্রুত সবার মুখের ওপর একবার চোখ বুলালেন মার্কুইস। তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে তাঁর দৃষ্টিতে। যেন একপাল ইঁদুর বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। পকেট থেকে টাকার থলে বের করলেন তিনি। মুখ খুলতে খুলতে বললেন, 'অদ্ভুত লোক তোমরা। না পার নিজেরা সাবধানে থাকতে, না বাচ্চাগুলোকে সাবধানে রাখতে। রাস্তায় বেরুলেই একটা-না-একটা এসে পড়বে গাড়ির তলায়। কি জানি, আমার ঘোড়ার পা ভেঙেছে কি না।' থলে থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ছুড়ে দিলেন লম্বা লোকটার দিকে।

তখনো কপাল চাপড়ে চিৎকার করছে লোকটা। 'মেরে ফেলেছে! আমার সোনা মানিককে মেরে ফেলেছে!'

এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন শক্ত-সমর্থ লোক। উপস্থিত সবাই দু পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল তাকে। তার কাঁধের ওপর মাথা রেখে আবার হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল লোকটা। ঝরনার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

'সব শুনেছি আমি', বলল সুঠামদেহী আগন্তুক। 'শান্ত হও গ্যাসপার্ড। বাচ্চাটা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। এমন আরামের মৃত্যু ক'জনের ভাগ্যে জোটে?'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল মার্কুইসের ঠোঁটের কোণে। 'বাঃ! তোমাকে তো খুব বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। নাম কী তোমার?'

'আর্নেস্ট দেফার্জ।'

'কর কী?'

'মদের দোকানি।'

'এই নাও তোমার বকশিশ।' বলে আরেকটা স্বর্ণমুদ্রা ছুড়ে মারলেন দেফার্জের দিকে। তারপর কোচোয়ানের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লেন, 'চালাও গাড়ি।'

গদিতে হেলান দিয়ে বসলেন মার্কুইস। চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা আত্মতৃপ্তির ভাব। যেন একটা মাটির পুতুল ভেঙে ফেলেছিলেন। দাম চুকিয়ে দিলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না তাঁর সেই আত্মপ্রসাদ। গাড়িটা সবেমাত্র চলতে শুরু করছে এমন সময় তাঁরই দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাটা উড়ে এসে পড়ল গাড়ির মেজেতে। টুং করে একটা শব্দ হল।

'থামাও গাড়ি!' চিৎকার করে উঠলেন মার্কুইস। 'কে ছুড়ল ওটা? কার এত বড় স্পর্ধা?'

একটু আগে দেফার্জ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু তখন আর সেখানে নেই দেফার্জ। গাড়ি ঘিরে থাকা বিক্ষুব্ধ লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। হতভাগ্য পিতা ফিরে গেছে ঝরনার কাছে। মৃত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

'কুত্তার দল!' চিৎকার করে উঠলেন মার্কুইস। 'যদি জানতে পারতাম কে ছুড়েছে তা হলে তাকেও চাকার নিচে পিষে ফেলতাম।'

জবাব দিল না কেউ। এমনকি চোখ তুলেও তাকাল না। জানে তারা, মার্কুইস যা বলেছেন তা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। প্রয়োজনে আইনের বাইরে যেতেও পিছপা হবেন না তিনি। তাই কথা বলা তো দূরের কথা, চোখ তুলে তাকাবার সাহসও কারো হল না। ব্যতিক্রম শুধু সেই মহিলা। উল বুনতে বুনতেই সে চোখ তুলে তাকাল মার্কুইসের চোখের দিকে। আত্মসম্মানে ঘা পড়ল তাঁর। অগ্নিদৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন মহিলাকে। ইঁদুরগুলোর ওপরও একবার চোখ বুলালেন। তারপর আবার আরাম করে বসে হাঁক ছাড়লেন, 'চল!'

সপাং করে চাবুক হাঁকাল কোচোয়ান। ছুটে চলল গাড়ি। নাকে এক টিপ নস্যি দিয়ে চোখ বুজলেন মার্কুইস।

সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি তখনো। সবুজ অরণ্যানী পেরিয়ে ছুটে চলেছে মার্কুইসের গাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বের করলেন মার্কুইস। একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে দূরে। তাঁর জমিদারি। গ্রামের পেছনে একটা পাহাড়। তার ওপর প্রাচীন এক দুর্গ। একসময় কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হত।

অরণ্যানী পেরিয়ে গ্রামের মুখে পৌঁছল গাড়ি। এবড়োখেবড়ো পথ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। গ্রামের অবস্থাও রাস্তার মতোই হতশ্রী। জীর্ণ বাড়িঘর। জীর্ণ সরাইখানা। মানুষগুলোও তেমনি। সারা শরীরে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের ছাপ। তাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হল হাজারো রকমের করের বোঝা। রাজার কর, গির্জার কর, মার্কুইসের কর। আরো কত রকমের কর দিতে হয় তাদের। শেষে আর কিছুই থাকে না নিজের জন্য।

banglainternet.com

গ্রামের পোস্টিং হাউসের সামনে থামল গাড়ি। ঘোড়া বদল করা হবে এখানে। কিছুক্ষণ বিরতি। ঝরনার দিকে দৃষ্টি গেল মার্কুইসের। জনা কয়েক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। ভাগ্যবিড়ম্বিত লোক ওরা। ওদের স্বাস্থ্য আর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। মুখ ফিরিয়ে নিতে যাবেন এমন সময় দৃষ্টি পড়ল এক লোকের ওপর। ঢাল বেয়ে নেমে এল লোকটা। যোগ দিল গ্রামবাসীর সাথে।

'ওই লোকটাকে ডাক তো', কোচোয়ানকে আদেশ করলেন মার্কুইস।

ডেকে আনা হল লোকটাকে। গ্রামবাসীও কৌতূহলী হয়ে একটু এগিয়ে এল।

'কী কর তুমি?' ধমকের সুরে জানতে চাইলেন মার্কুইস।

ঘাবড়ে গেল মাঝবয়সী লোকটা। ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। ঢোক গিলে কোনো রকমে বলল, 'রাস্তা মেরামতের কাজ করি।'

'এদিকে আসার সময় তোমার পাশ দিয়েই তো এসেছি আমি', বললেন মার্কুইস।

'জি, মঁসিয়ে।'

'তখন অমন হাঁ করে কী দেখছিলে গাড়ির দিকে?'

'একটা লোক দেখছিলাম, মঁসিয়ে', সামান্য একটু ঝুঁকে, হাতের ক্যাপটা দিয়ে গাড়ির নিচে দেখাল লোকটা। 'ওখানে। একটা লোহার কাঠামো ধরে চিৎ হয়ে ঝুলে ছিল।'

'ঝুলে ছিল মানে? মরার জন্য?'

'তা তো জানি না, মঁসিয়ে।'

'কে লোকটা?' চিৎকার করে উঠলেন মার্কুইস। 'চেন কেউ। নাম কী! বাড়ি কোথায়?'

'এ গাঁয়ের লোক নয় সে, মঁসিয়ে। এদিকে আগে কখনো দেখি নি।'

'দেখতে কেমন লোকটা?'

'লম্বা। সারা শরীর ধুলোয় একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে ঠিক ভূতের মতো লাগছিল। ঢালের কাছে যখন গাড়ির গতি কমে তখন নেমে যায় ভূতটা। জঙ্গলের দিকে চলে গেছে।'

'তা হলে একটা চোর এসেছে আমার সাথে', বললেন মার্কুইস। 'সাবধানে থেক তোমরা।' পোস্টিং হাউসের ফটকের কাছে দাঁড়ানো এক লোকের দিকে তাকালেন তিনি। হাত তুলে ডাকলেন, 'গ্যাবেল, এদিকে এস।'

মঁসিয়ে গ্যাবেল পোস্টিং হাউসের প্রধান। আবার এভরেমঁদ জমিদারির খাজনাপত্তর আদায়কারী। দুটো দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করে সে।

মার্কুইসের ডাক শুনে এগিয়ে এল গ্যাবেল, 'জি, মঁসিয়ে।'

'আমার মনে হয় লোকটা কোনো কুমতলবে এসেছে এদিকে', বললেন মার্কুইস। 'ওকে দেখামাত্র পাকড়াও করবে।'

'জি, মঁসিয়ে। আপনার আদেশ পালন করতে পারলে খুশি হব।'

'ঠিক আছে তা হলে, গ্যাবেল। চোখ-কান খোলা রেখ। চল কোচোয়ান।'

গ্রাম পেরিয়ে পাহাড়ি পথ ধরল গাড়ি। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মার্কুইস যখন বিলাসবহুল শ্যাতোয় পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। চাকরবাকরেরা ছুটে এসে ফটক খুলে দিল। দুজনের হাতে মশাল। বাগানের ভেতর দিয়ে, বাঁধানো পথ ধরে গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে লাগাম টানল কোচোয়ান। মশালধারী এক ভৃত্য এসে দরজা মেলে ধরল।

'চার্লস ফিরেছে লন্ডন থেকে?' নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন মার্কুইস।

'না, মঁসিয়ে', বলল ভৃত্য।

'তা হলে আজ রাতে আর আসবে না মনে হয়। তবুও দুজনের খাবার দিতে বল। পনের মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

পনের মিনিটের মধ্যেই খাবার ঘরে ঢুকলেন মার্কুইস। একাই বসলেন খেতে। পরম তৃপ্তির সাথে খেতে লাগলেন। পথে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা ভুলে যান নি তিনি। তবে কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার পাত্র নন মার্কুইস। তা যত দুর্বোধ্যই হোক না কেন।

খাওয়াদাওয়া যখন মাঝ পর্যায়ে, হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল জানালার কাচের ওপর। মুহূর্তের জন্য মাত্র। মনে হল, কে যেন দ্রুত চলে গেল জানালা ঘেঁষে। সচকিত হয়ে উঠলেন মার্কুইস। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'দেখ তো, কে গেল জানালার পাশ দিয়ে?'

জানালা খুলল ভৃত্য। এদিক-ওদিক উঁকি মেরে বলল, 'না মঁসিয়ে, কেউ না।'

'ঠিক আছে। বন্ধ করে দাও।'

আবার খাওয়ায় মন দিলেন মার্কুইস। কিছুক্ষণ পরই চাকার আওয়াজ শোনা গেল বাইরে।

'চার্লস এসেছে মনে হয়' বললেন তিনি। 'এখানে নিয়ে এস ওকে।'

ছুটে গেল ভৃত্য। কয়েক মুহূর্ত পরই ফিরে এল এক যুবককে নিয়ে। যুবকটি মার্কুইসের ভাইপো। চার্লস এভরেমঁদ। ইংল্যান্ডে সে পরিচিত চার্লস ডারনে নামে। খুবই ভদ্রভাবে ভাইপোকে পাশে বসালেন মার্কুইস। তবে করমর্দন করলেন না।

'দুজনের খাবার আছে এখানে', বললেন তিনি। 'খিদে থাকলে খেতে পার। হাত-মুখ ধুয়ে এস।'

উঠে গেল চার্লস ডারনে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে এল খাবার টেবিলে। মার্কুইসের মুখোমুখি বসে খেতে শুরু করল।

banglainternet.com

'এবার তা হলে অনেকদিন থেকে এলে লন্ডনে', বললেন মার্কুইস।

'হ্যাঁ, নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে', বলল চার্লস। 'এবার মারাত্মক এক বিপদে পড়েছিলাম। প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গেছি। অবশ্য প্রাণ গেলেও দুঃখ ছিল না। যে দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছি, তার জন্য হাসিমুখে মরতে পারি।'

'না না, মরতে যাবে কেন?' ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটিয়ে বললেন মার্কুইস।

'আমি মরতে বসলেও যে আপনি আমায় বাঁচাবার জন্য কোনো চেষ্টা করবেন না, তা আমি জানি', বলল চার্লস। 'বরং সুযোগ পেলে অনেক আগেই আমাকে বাস্তিলে ঢোকাতেন। আপনি রাজার কাছে গিয়েছিলেন আমাকে বাস্তিলে পাঠাবার অনুমতি চাইতে। কী ঠিক বলি নি?'

'তা ঠিকই বলেছ', হাসিটা মুখে ধরে রেখে বললেন মার্কুইস। 'আমাদের পরিবারের সুনাম রক্ষার স্বার্থে অনেক কিছুই করা উচিত ছিল আমার। তোমাকে কিছু দিন বাস্তিলে রাখতে পারলে তোমারই উপকার হত।'

নীরবে কিছুক্ষণ খেল চাচা-ভাইপো। তারপর চার্লস বলল, 'আমাদের পরিবারের সুনামের কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি এখনো, চাচা? অতীতে এত অন্যায় আমরা করেছি এবং এখনো করে যাচ্ছি, তাতে আমার বিশ্বাস, ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত বংশ হিসেবে নাম লেখা থাকবে আমাদের। ফরাসিবাসীর অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নই আমরা।'

'তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না, চার্লস। যা চিরসত্য সেটাই তো আমি করতে চেয়েছি? প্রজারা রাজাকে শ্রদ্ধা করবে, রাজার দাসত্ব মেনে চলবে, এটাই তো চিরসত্য। আমি তো মনে করি আমাদের প্রজারা এখনো আমাদের শ্রদ্ধা করে, মান্য করে। কী বল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না চার্লস। পট থেকে কফি ঢালল কাপে। একটা কাপ ঠেলে দিল চাচার দিকে। নিজে এক চুমুক খেল। তারপর বলল, 'সেটা চাবুকের ভয়ে করে। তাদের বাধ্য করা হয়। কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে, চাচা। কিছু দিন আগেও আমরা যা খুশি করেছি। যাকে খুশি বাস্তিলে পাঠিয়েছি। যাকে ইচ্ছে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি। সেদিন আর নেই, চাচা। মানুষের বুকে গুমরে থাকা অসন্তোষ কত দিন আর চাপা পড়ে থাকবে? সময় এসেছে বিস্ফোরণের। আমি যেন সেই ধ্বনি মাঝে মধ্যেই শুনতে পাই।'

নড়েচড়ে বসলেন মার্কুইস। কেমন যেন উদ্বেগ আর নৈরাশ্য ফুটে উঠল তাঁর বসার ভঙ্গিতে। কিন্তু কথাবার্তায় এতটুকু দম্ভোক্তি কমে নি তাঁর।

'কুকুরের চিৎকার শুনতে পাও তুমি', বললেন তিনি। 'আমার দৃষ্টিতে ওরা কুকুর ছাড়া আর কিছুই নয়। কুকুরদের শায়েস্তা করার জন্য চাবুকই হল সবচেয়ে ভালো অস্ত্র। যত বেশি চাবকাবে ততই তোমার দাসত্ব মেনে নেবে।'

'এখানেই আমরা মারাত্মক ভুল করেছি, চাচা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে ভুল করেছে। এখন সেই ভুল শুধরাবার সময় এসেছে। আর এ কারণেই আমার ফ্রান্সে আসা।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'মৃত্যুশয্যায় আমার মায়ের শেষ অনুরোধ রক্ষা করা।'

'কী অনুরোধ?'

'অতীতে যে ভুল আমরা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করা। প্রয়োজনে প্রজাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

'প্রজা?' হোহো করে হেসে উঠলেন মার্কুইস। 'আগে তো জমিদারি পাও তারপর প্রজাদের কথা ভেব। আমি তো আজই মরে যাচ্ছি না।'

'সে কামনা আমি করি না', বলল চার্লস। 'আপনি আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন। আপনি মারা যাবার পর আমি যদি কখনো এ সম্পত্তির মালিক হই তা হলে সব বিলিয়ে দেব গরিব-দুঃখীদের মাঝে।'

'প্রজাদের ভরপেটের ব্যবস্থা করে দিয়ে তোমার চলবে কী করে, না খেয়ে?'

'না খেয়ে থাকব কেন?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল চার্লস। 'আমি কি এখন না খেয়ে আছি? কাজ করে খাব। দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষই তো কাজ করে খায়।'

'কোথায়? ইংল্যান্ডে?'

'হ্যাঁ। অনেক ফরাসি ভদ্রলোক কাজ করে সেখানে।'

'তাদের মধ্যে বোভেয়াবাসী এক ডাক্তারও আছেন। চেন তাঁকে?'

'চিনি।'

'ডাক্তারের একটা সুন্দরী মেয়ে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ইংল্যান্ডে তোমার ব্যস্ততার কারণ হল সেই ডাক্তার আর তার মেয়ে। ঠিক আছে। তুমি ক্লান্ত। শুয়ে পড় গিয়ে। আমারও ঘুম পাচ্ছে। কাল সকালে কথা হবে। শুভরাত্রি।'

উঠে দাঁড়াল চার্লস। মাথা নুইয়ে চাচাকে সম্মান দেখাল। তারপর বেরিয়ে গেল।

চার্লস বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন মার্কুইস। তারপর শোবার ঘরে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন।

নিস্তব্ধ রাত। গ্রামের লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। রাতজাগা পাখির চিৎকার। একটা পেঁচা ডেকে উঠল কাছেই। গা ছমছম করে উঠল মার্কুইসের। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল প্রহরের পর প্রহর। একসময় ফিকে হয়ে এল অন্ধকার।

BanglaInternet.com

রক্তরাঙা হয়ে উঠল পুবের আকাশ। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তারই লাল আভা। পাখপাখালির ডাকে মুখর চারদিক। নতুন একটা দিনের বার্তা পৌঁছে দিল সবার কাছে। এক এক করে খুলতে শুরু করল বাড়িঘরের জানালা-দরজা। সাতসকালেই কাজে বেরিয়ে পড়ল গ্রামবাসীরা।

কিন্তু শ্যাতোয় ভোর হল অনেক দেরিতে। জানালা-দরজা খুলতে শুরু করল ভৃত্যরা। সকালের কাঁচা রোদ লাফিয়ে ঢুকল ভেতরে। কেউ কেউ ছুটে গেল আস্তাবলের দিকে। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে বের হবার জন্য। পা ঠুকছে মাটিতে। শেকলে বাঁধা কুকুরগুলোও তিড়িংবিড়িং করছে ছাড়া পাওয়ার জন্য।

এমন সময় ভয়ানক শব্দে বেজে উঠল শ্যাতোর বিরাট ঘণ্টাটা। কাজকর্ম ফেলে ছোটাছুটি শুরু করল ভৃত্যরা। চিৎকার-চেঁচামেচিতে সে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এখানে-ওখানে দৌড়াদৌড়ি করছে লোকজন। কেউ কেউ ঘোড়ায় চেপে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে শ্যাতো থেকে।

রহস্যটা জানা গেল একটু পর। এ মুখ থেকে ও মুখ, এ কান থেকে সে কান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। মার্কুইস অব এভরেমঁদ খুন হয়েছেন। বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে তাঁর মৃতদেহ। বুকের বাঁ পাশে আমূল বিঁধে রয়েছে একটা ছোরা। বাঁটের সঙ্গে আটকানো এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা : তাড়াতাড়ি একে কবরে নিয়ে যাও।

—জ্যাক।

পাঁচ

লন্ডন।

মার্কুইস অব এভরেমঁদ খুন হবার এক বছর পর। লন্ডনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে চার্লস ডারনে। শিক্ষকতার পেশা বেছে নিয়েছে। ইংরেজ তরুণ-তরুণীদের ফরাসি ভাষা শেখায়। সময় পেলেই ছুটে যায় ডাক্তার ম্যানেটের বাসায়। যাবার কারণটা অবশ্য লুসি। লুসিকে ভালবাসে ও। সেই ওল্ড বেইলিতে প্রথম যেদিন দেখেছিল সেদিনই ভালবেসে ফেলেছে। মামলার পর থেকে আরো যেন গভীর হয়েছে ভালবাসা। তবে এ ভালবাসার কথা কাউকে জানায় নি ও। এমনকি লুসিকেও নয়। আজ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাপারটা ডাক্তার ম্যানেটকে জানাবে। লুসি এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই। মিস প্রসকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে। ডাক্তার ম্যানেটকে যা বলার আজই বলতে হবে। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

জানালার পাশে বসে বই পড়ছিলেন ডাক্তার ম্যানেট। চার্লসকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন। বইটা এক পাশে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর।

'কী খবর, চার্লস?' করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার ম্যানেট। 'তিন-চার দিন হল দেখা নেই তোমার। কেমন আছ?'

'ভালো।'

'আমরা তো ভাবছি তোমার আবার অসুখবিসুখ হল কি না। কালই তোমার কথা হচ্ছিল। মিস্টার স্ট্রাইভার আর সিডনি কারটন এসেছিল। তোমার কথা জিজ্ঞেস করল।'

'আচ্ছা', অন্যমনস্কভাবে বলল চার্লস। 'লুসি—'

'ভালোই আছে', বললেন ডাক্তার ম্যানেট। 'বাড়িতে নেই ও। মিস প্রসের সঙ্গে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে। শিগগিরই এসে পড়বে।'

'আপনার মেয়ে যে বাড়িতে নেই তা জেনেই আমি এসেছি। ও ফিরে আসার আগেই আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।'

'বল। ওই চেয়ারটা টেনে বস।'

বসল চার্লস। কিন্তু চুপ করে রইল। কথাগুলো কীভাবে শুরু করবে তা-ই যেন মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে।

'মঁসিয়ে ম্যানেট', অবশেষে মুখ খুলল চার্লস। 'গত দেড়টা বছর এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করছি আমি। আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। এজন্য নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি। আজ আমাদের মধ্যে যে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারই দাবি নিয়ে কিছু কথা...'

হাত তুলে চার্লসকে নিবৃত্ত করলেন ডাক্তার ম্যানেট। 'কথাটা কি লুসি সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ। আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

'কিছুটা পেরেছি। তবু বল।'

'আমি আপনার মেয়েকে ভালবাসি। অন্তর থেকে ভালবাসি। আপনি নিজেও তো একদিন ভালবেসেছেন। তা হলে নিশ্চয়ই বুঝবেন আমার মনের আকুলতা।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন ডাক্তার ম্যানেট। এবার সরাসরি তাকালেন চার্লসের দিকে।

'তুমি কি লুসিকে এ কথা বলেছ?'

'না।'

'চিঠিপত্র লিখেও না?'

banglainternet.com

'না। জানি আমি, ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার স্নেহ পায় নি লুসি। ওর জীবনের সতেরটি বছর কেটেছে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। তারপর অকস্মাৎ আপনাকে পেয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। ওর অন্তরের সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা উজাড় করে দিল। আপনিই হয়ে উঠলেন ওর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আর আপনিও দীর্ঘ কারাবাস কাটিয়ে ফিরে পেলেন একমাত্র সন্তানকে। যার স্নেহের পরশে ফিরে পেলেন নতুন জীবন। ওকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল আপনার নতুন পৃথিবী। আমি জানি, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার জীবনে ওর প্রয়োজন কতখানি। ওই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া আপনার পক্ষে কতখানি কষ্টকর তা-ও আমি জানি। তাই আমি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াব না আপনাদের মাঝে। ওকে কখনো দূরে সরিয়ে নেব না আপনার কাছ থেকে। লুসি আমার স্ত্রী হলেও আপনার এখানেই থাকবে।'

ডাক্তারের হাতের ওপর একটা হাত রাখল চার্লস। মৃদু চাপ দিল। চোখ তুলে তাকালেন ডাক্তার। তাঁর চোখে-মুখে শুধু সন্দেহের ছায়া দেখতে পেল চার্লস। বুঝতে পারল, একদিকে মেয়ের শান্তিময় ভবিষ্যৎ, অন্যদিকে নিজের সুখ-চিন্তা। এই দুইয়ের লড়াই চলছে ডাক্তারের মনের মধ্যে। লড়াইয়ে যে নিজের সুখের চিন্তা পরাজিত হতে বাধ্য, তা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছেন।

ডাক্তার ম্যানেটকে চুপ থাকতে দেখে বলে চলল চার্লস, 'আপনার মতো আমিও ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত। এখানে কেউ নেই আমার। আমি আশা করি, আপনাদের জীবন, আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের সবকিছুর অংশীদার হওয়ার সুযোগ দেবেন আমাকে। আমি আমৃত্যু আপনাদের বিশ্বস্ত হয়ে থাকতে চাই।'

'ধন্যবাদ তোমাকে, চার্লস', বললেন ডাক্তার ম্যানেট। 'তুমি যেমন আন্তরিকভাবে কথাগুলো বললে তেমনি আমিও আন্তরিকভাবে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। তোমার কি কখনো মনে হয়েছে লুসি তোমাকে ভালবাসে?'

'না।'

'এ ব্যাপারে ওর সাথে কথা বলতে চাও?'

'না। তবে আপনার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাই।'

'প্রতিশ্রুতি! কিসের প্রতিশ্রুতি?'

'লুসি যদি কখনো আপনাকে বলে ও আমাকে ভালবাসে, তা হলে আশা করি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না ওকে।'

'ঠিক আছে, দিলাম প্রতিশ্রুতি', বললেন ডাক্তার ম্যানেট। 'আমি যদি কখনো জানতে পারি ও তোমাকে ভালবাসে, তা হলে নিজেই ওকে তুলে দেব তোমার হাতে। তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকলেও আমি সব ভুলে যাব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। লুসির সুখই আমার সুখ। আমার নিজের সুখের জন্য কখনো ওর সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না আমি।'

শেষের দিকে গলাটা ধরে এল ডাক্তারের। চুপ করে রইলেন তিনি। অদ্ভুত এক দৃষ্টি ভর করল তাঁর চোখে।

হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এল চার্লসের। কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা ভয় মেশানো কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ মঁসিয়ে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যেমন খোলাখুলি সব বললেন তেমনি আমিও খোলাখুলি বলতে চাই। আজ আমাকে যে নামে আপনারা চেনেন সেটা আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নামটা আপনাকে জানাতে চাই। এবং কেন আমি নিজের দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে পড়ে আছি তা-ও জানাতে চাই।'

'দরকার নেই।'

'আমি আমার কোনো কিছুই গোপন রাখতে চাই না আপনার কাছে।'

'চুপ কর!' চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার ম্যানেট।

'কথাটা আপনার শোনা উচিত, মঁসিয়ে।' মিনতি ঝরে পড়ল চার্লসের কণ্ঠে। 'তা হলে আপনার সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যেত।'

'না!' আবার চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার ম্যানেট। 'দরকার হলে আমি নিজেই তোমাকে জিজ্ঞেস করব। যদি লুসির সাথে তোমার বিয়ে হয়, ইচ্ছে হলে বিয়ের দিন সকালে বোলো। তখন শুনব। এখন নয়। এবার তা হলে এস। লুসির আসার সময় হয়ে গেছে। আমি চাই না ও আমাদের একসঙ্গে দেখুক। যাও তুমি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল চার্লস।

চার্লস ডারনের মতো আরো একজন আসে লুসিদের বাসায়। সে হল কারটন। সেই মক্কেলশূন্য উকিল সিডনি কারটন। তবে চার্লসের মতো ঘন ঘন আসে না সে। মাঝে মধ্যে আসে। যদিও গল্পগুজবে তেমন একটা অংশ নেয় না কারটন। গম্ভীর মুখে বসে থাকে। মাঝে মধ্যে দার্শনিকের মতো দু-একটা কথা বলে। ভাবখানা যেন পৃথিবীর কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই তার।

এক সকালে লুসিদের বাসায় এল কারটন। একা একা বসে সেলাই করছিল লুসি। কারটনের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। একা থাকলে কখনো কারটনের সামনে সহজ বোধ করে না লুসি। আজো কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একটা চেয়ার টেনে বসল কারটন। মুখটা কেমন যেন বিষণ্ন। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সিডনি কারটন উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে, চরিত্রহীন হতে পারে, কিন্তু এমন মন-মরা ভাব তো কখনোই দেখা যায় নি তার মধ্যে। লুসির মনে হল, আজ অতিরিক্ত মদ খেয়ে এসেছে কারটন। এই মদই তার প্রতিভা, কর্মশক্তি সব নষ্ট করে দিয়েছে।

'আপনার কি অসুখ করেছে নাকি, মিস্টার কারটন?' জিজ্ঞেস করল লুসি।

'না। তবে যে জীবন যাপন করি তাতে সুস্থ থাকার কথা নয়।'

BanglaInternet.com

'মাফ করবেন, মিস্টার কারটন। একটা কথা না বলে পারছি না। ভালো জীবন যাপন করতে কেউ কি আপনাকে বাধা দিয়েছে? কেন নিজেকে এভাবে ধ্বংস করছেন?'

'না, কেউ বাধা দেয় নি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলতে পারেন। ব্যাপারটা খুবই লজ্জাকর।'

'লজ্জাকর জানেন যদি তা হলে বদ অভ্যাসটা ছাড়ছেন না কেন?'

জবাব দিতে গিয়ে চোখ দুটো ভিজে গেল কারটনের। 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে, মিস ম্যানেট। এর চেয়ে আর ভালো হতে পারব না আমি। অনেক চেষ্টা করেছি। তবু পারি নি। আর উঠবার আশা নেই আমার। এখন ক্রমেই ডুবে যাচ্ছি।'

চোখের পানি লুকোবার জন্য টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে, দুই হাতের তালুতে মুখ ঢাকল কারটন। আবেগে সারা শরীর কাঁপছে তার। টেবিলটাও কাঁপছে কনুইয়ের ভারে। একটু পর মুখ থেকে হাত নামাল কারটন।

'মাফ করবেন, মিস ম্যানেট। অহেতুক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। শুনবেন?'

'শুনলে যদি আপনার কোনো উপকার হয় তবে নিশ্চয়ই শুনব। বলুন কী বলতে চান।'

'আমার কথা শুনে শিউরে উঠবেন না, মিস ম্যানেট। ঘৃণাও করবেন না। ভাববেন একটা পাগল প্রলাপ বকছে আপনার সাথে।'

'এ কথা বলছেন কেন, মিস্টার কারটন। আপনি যা ভাবছেন তার চেয়েও বেশি যোগ্যতা আছে আপনার। ইচ্ছে করলে আপনি এখনো যোগ্য লোক হয়ে উঠতে পারেন।'

'কার যোগ্য? আপনার? আপনি কি ভালবাসতে পারবেন আমাকে? আমি জানি, মিস ম্যানেট, পারবেন না। এই মাতাল, চরিত্রহীন লোকটাকে আপনি ভালবাসতে পারেন না। এমনকি আমার জন্য আপনার অন্তরে কোনো করুণাও থাকতে পারে না। আমি আপনার যোগ্য নই, মিস ম্যানেট। কোনোদিন হতেও পারব না।'

বিবর্ণ হয়ে গেল লুসির মুখটা। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ভাল না বেসেও কি আপনাকে বাঁচাতে পারি না, মিস্টার কারটন? আপনার কোনো উপকারেই আসতে পারি না?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কারটন। 'না, মিস ম্যানেট। আপনি যদি ধৈর্য ধরে আমার দু-একটি কথা শোনেন তাতেই আমার যথেষ্ট উপকার হবে। কিছু দিন আগে আমি একটা সুখস্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্ন ছিল আপনাকে কেন্দ্র করেই। যেদিন প্রথম আপনাকে দেখলাম সেদিন থেকেই আমার এই নিঃসাড় জীবনে সঞ্চার হয়েছিল নতুন প্রাণ। মনে হয়েছিল, এতদিন আমি এক অন্ধকার সুড়িতে অবলুপ্ত ছিলাম। আপনি এসে আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন এক আলোর রাজ্যে। সেদিন থেকেই আমার এই নষ্ট জীবনকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম। শেষবারের মতো চেষ্টাও করেছিলাম এই পঙ্কিল জীবন ঝেড়ে ফেলে সুস্থ জীবনে ফিরে আসার। কিন্তু পারি নি। কী করে পারব! আমি যে আকণ্ঠ ডুবে গেছি পাঁকের ভেতর। কে আমাকে টেনে তুলবে?'

'এত ভেঙে পড়েছেন কেন, মিস্টার কারটন? আবার চেষ্টা করে দেখুন।'

'না, মিস ম্যানেট। লাভ হবে না। সে-শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

'তা হলে আমি কি আপনার কোনো উপকারেই আসতে পারি না?'

ম্লান একটু হাসি দেখা গেল কারটনের ঠোঁটের কোণে। 'আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, মিস ম্যানেট। এই যে প্রাণ খুলে আপনার সাথে দুটো কথা বলতে পারলাম, বুকের বোঝা হালকা করতে পারলাম, এটা কি কম উপকার হল? আজকের এই দিনটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবে একটা অনুরোধ, আমাদের এই আলাপের কথা কোনোদিনও কাউকে বলবেন না। এমনকি আপনার অতি প্রিয়জনকেও না।'

'তাতে যদি আপনি খুশি হন, তাই হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস ম্যানেট।'

উঠে দাঁড়াল কারটন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে থেমে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, লুসির চোখে পানি। 'কাঁদবেন না, মিস ম্যানেট। কাঁদবেন না। আমি এর যোগ্য নই। আমি এমনিতেই ধন্য। কোথাকার এক নামগোত্রহীন, ছন্নছাড়া সিডনি কারটন নামের এক লোক যে আপনার হৃদয়ের এক কোণে এতটুকু হলেও স্থান লাভ করতে পেরেছে, এ আমার পরম সৌভাগ্য। এর প্রতিদান আপনি নিশ্চয়ই পাবেন, মিস ম্যানেট। মনে রাখবেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন, আপনার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করব না। আপনার সুখের জন্য দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করব। বিদায়, মিস ম্যানেট।'

বেরিয়ে গেল সিডনি কারটন।

বাংলাইন্টারনেট.কম

ছয়

তিন দিন ধরে দেফার্জের মদের দোকান খুব সরগরম। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভিড় লেগেই থাকে। সোমবার শুরু হয়েছে, আজ বুধবার। সকাল ন'টার সময়ই ভরে যায় দোকান। যারা বসার জায়গা পায় নি তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করছে। গ্লাস হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিসফিস করে কথা বলছে।

banglainternet.com

দুপুরে অচেনা এক লোক নিয়ে দোকানে ঢুকল দেফার্জ। লোকটা সেই নীল টুপিওয়ালা রাস্তা মেরামতকারী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই। কিন্তু কথা বলল না কেউ।

'কী খবর তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল দেফার্জ।

'ভালো।' সম্মিলিতভাবে জবাব দিল সবাই। 'তোমার?'

'ভালো নয়', বলল দেফার্জ। 'চারপাশে সরকারি গোয়েন্দারা ঘুরঘুর করছে। কে কখন ধরা পড়ে যাই ঠিক নেই।' স্ত্রীর দিকে ফিরল সে। 'বউ, এ লোকটা রাস্তা মেরামতের কাজ করে। নাম জ্যাক। অনেক দূর থেকে আসছি আমরা। ওকে এক গ্লাস মদ দাও।'

নীল টুপির সামনে এক গ্লাস মদ এনে রাখল মাদাম দেফার্জ। গ্লাস তুলে চুমুক দিল লোকটা। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল দেফার্জ। তারপর বলল, 'চল, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে উঠানে এল ওরা। সেখান থেকে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে সেই চিলেকোঠায়। এখানেই ডাক্তার ম্যানেট থাকতেন একসময়। এখন জ্যাকদের আস্তানা। দেফার্জের বিশ্বস্ত তিন জ্যাক রয়েছে সেখানে। রাস্তা মেরামতকারীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল দেফার্জ। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'জ্যাক এক, জ্যাক দুই, জ্যাক তিন', বলল সে। 'আমাদের এই জ্যাক বন্ধুর সাথে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করে এখানে নিয়ে এসেছি। ওর মুখে সব শুনবে তোমরা।' রাস্তা মেরামতকারীর দিকে তাকাল সে। 'শুরু কর তুমি।'

'কোথা থেকে শুরু করব?'

'প্রথম থেকে।'

'বেশ। শোন তা হলে। বছরখানেক আগে গ্যাসপার্ডকে দেখি আমি। মার্কুইসের গাড়ির নিচে ঝুলে ছিল। তারপর কোথায় যেন গায়েব হয়ে যায় লোকটা। হঠাৎ আবার অনেক দিন পর দেখা।'

'চিনলে কী করে?' জানতে চাইল জ্যাক তিন। 'মাত্র একবার দেখেছ। তা-ও আবার গাড়ির নিচে।'

'ওর লম্বা শরীর দেখে', বলল রাস্তা মেরামতকারী। 'সেদিনও আমি কাজ করছিলাম রাস্তায়। সময়টা সন্ধ্যার কাছাকাছি। হঠাৎ দেখলাম সাত জন সৈনিক নেমে আসছে পাহাড় থেকে। তাদের মাঝখানে গ্যাসপার্ড। হাত দুটো পেছনে বাঁধা। এক সৈনিকের ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। হোহো করে হেসে উঠল সৈনিকরা। চুল ধরে টেনে তুলল এক জন। মুখটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে গ্যাসপার্ডের। টেনেহিঁচড়ে গ্রামে আনা হল তাকে। সমস্ত গ্রাম যেন ভেঙে পড়ল লোকটাকে একনজর দেখার জন্য।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক দুই।

'গ্রামে এনে একটা লোহার খাঁচায় বন্দি করে রাখা হল তাকে। গ্রামের মানুষের মধ্যে চলে ফিসফিসানি, কানাকানি। তাদের ধারণা, গ্যাসপার্ডকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মহামান্য রাজার কাছে আবেদন করা হয়েছে, বন্দিকে যেন ক্ষমা করা হয়। সে নাকি সন্তান হারানোর শোকে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু মন গলল না রাজার। উলটো আবেদনপত্র নিয়ে যারা রাজার কাছে গিয়েছিল, তাদের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় রাজার রক্ষীরা। শেষে এক রোববার রাতে, গ্রামবাসীরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন এক দল সৈনিক বেরিয়ে এল কারাগার থেকে। সারা রাত ধরে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাল। নিজেরা বসে থেকে কেবল হুকুম দিল, মদ খেল আর হৈ-হল্লা করল। সকালে উঠে গ্রামবাসীরা দেখল, ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়া বড় এক ফাঁসিকাঠ। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু।' ঘাড় বাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকাল রাস্তা মেরামতকারী। যেন এই চিলেকোঠার ভেতরও ফাঁসিকাঠটা দেখতে পাচ্ছে সে।

'সেদিন কোনো কাজ করল না গ্রামবাসীরা', বলে চলল রাস্তা মেরামতকারী। 'মন খারাপ করে ঘরে বসে রইল। আর অবাক হয়ে দেখতে লাগল অদ্ভুত জিনিসটা।'

'দুপুরের দিকে হঠাৎ ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই দেখা গেল এক দল সৈনিক। সঙ্গে সেই হতভাগ্য বন্দি। আগের মতোই হাত বাঁধা। মুখটাও বাঁধা এক টুকরো কাপড় দিয়ে। তারপর সেই চল্লিশ ফুট উঁচুতে তুলে ফাঁসি দেওয়া হল তাকে। ওভাবেই ঝুলিয়ে রেখে ফিরে গেল সৈনিকরা। বাতাসে দুলতে লাগল গ্যাসপার্ডের দেহ। কী বীভৎস! সোমবার সকালে আমি যখন গ্রাম ছেড়ে আসি তখনো ঝুলছিল দেহটা। মঙ্গলবার এই ভদ্রলোকের সাথে দেখা। আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন উনি। উনার সাথেই পৌঁছেছি এখানে।'

'এখন তা হলে কী করা উচিত আমাদের?' জানতে চাইল প্রথম জ্যাক।

'খুনের বদলে খুন', দাঁতে দাঁত চেপে বলল দেফার্জ। 'এভরেমঁদ পরিবারের প্রত্যেকটা লোককে খুন করব আমরা। শ্যাতোটাও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেব।'

সেদিনই মধ্যরাত। দোকানে ঢুকল দেফার্জ। স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বেচাকেনার হিসাব মেলাচ্ছে মাদাম দেফার্জ। হিসাব মিলিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। 'পুলিশের জ্যাক কী খবর দিল আজ?'

'তেমন কিছু না', বলল দেফার্জ। 'সেইন্ট আন্তোইনের ওপর চোখ রাখার জন্য নতুন একজন গুপ্তচর নিয়োগ করেছে সরকার।'

banglainternet.com

'ভালো।' ভুরু জোড়া উঁচু হল মাদামের। 'ওকেও তা হলে তালিকাভুক্ত করে ফেলতে হয়। নাম কী ব্যাটার?'

'জন বরসাদ। ইংরেজ।'

নামটা বিড়বিড় করল মাদাম দেফার্জ। 'দেখতে কেমন?'

'কালো চুল। কালো চোখ। মুখটা লম্বাটে। নাকটা বাঁ দিকে সামান্য বাঁকানো। ফুট পাঁচেক লম্বা। বয়স চল্লিশের মতো।'

'যথেষ্ট হয়েছে। আর দরকার নেই। কালই নামটা উঠে যাবে তালিকায়।'

পরদিন সকাল। কাউন্টারের পেছনে বসে রয়েছে মাদাম দেফার্জ। যথারীতি উল বুনছে। এমন সময় একটা লোক ঢুকল দোকানে। চোখ তুলে তাকাল মাদাম। গতকাল স্বামীর দেওয়া বর্ণনার একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল।

হাতের উল আর কাঁটা নামিয়ে রাখল মাদাম দেফার্জ। কাউন্টারের ওপর থেকে একটা গোলাপ তুলে নিল। পিন দিয়ে চুলে লাগাল। আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল ওই সময়। খদ্দেররা সব একে একে বেরিয়ে যেতে লাগল দোকান থেকে।

'সুপ্রভাত, মাদাম', বলল আগন্তুক।

'সুপ্রভাত মঁসিয়ে।'

'এক গ্লাস মদ আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দেবেন, মাদাম।'

বিনয়ের সঙ্গে নির্দেশ পালন করল মাদাম দেফার্জ।

'খুব ভালো জিনিস দিয়েছেন, মাদাম', এক চুমুক খেয়ে বলল লোকটা।

'ধন্যবাদ, মঁসিয়ে', বলেই আবার উল-কাঁটা তুলে নিল মাদাম। মদটা মোটেও ভালো নয়, জানে সে।

'খুব সুন্দর বোনেন আপনি, মাদাম', বলল আগন্তুক। 'নকশাটাও সুন্দর।'

'সত্যি?' আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসল মাদাম দেফার্জ।

'হ্যাঁ, মাদাম। কী করবেন ওটা দিয়ে?'

'কী আর করব। এই সময় কাটানো আর কি।'

নীরবে কয়েকটা চুমুক দিল আগন্তুক। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। তারপর আবার তাকাল মাদামের দিকে।

'আপনার স্বামী আছে, মাদাম?'

'আছে।'

'বাচ্চাকাচ্চা?'

'নেই।'

'ব্যবসা মনে হয় মন্দা যাচ্ছে, তাই না?'

'তা যাচ্ছে একটু। এখানকার মানুষের পেটে খাবার যোগাতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। মদ খাবার পয়সা কোথায় তাদের?'

'হ্যাঁ, খুবই গরিব এরা। জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হয় এদের সাথে। ঠিকই বলেছেন আপনি।'

'আমি বললাম কোথায়?' অবাক হয়ে বলল মাদাম দেফার্জ। 'বলছেন তো আপনি।'

'ঠিক আছে। ধরে নিলাম আমিই বলেছি। তবে কথাগুলো যে সত্যি তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।'

'স্বীকার করতে হবে মানে?' জোরগলায় বলল মাদাম দেফার্জ। 'দেখুন মঁসিয়ে, আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে দোকান চালাই। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অন্যদিকে মন দেওয়ার ফুরসত কোথায় আমাদের?'

মাদাম দেফার্জের কথায় এতটুকুও হাল ছাড়ল না আগন্তুক। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে। 'হতভাগ্য গ্যাসপার্ডের ফাঁসিটা বড়ই দুঃখজনক। কী ভয়ঙ্কর শাস্তি! গাঁয়ের লোকেরা বড় কষ্ট পেয়েছে ওর জন্য।'

'খুন করলে শাস্তি তো পেতেই হবে', বলল মাদাম। 'এতে কষ্ট পাবার কী আছে?' হঠাৎ দরজার দিকে তাকাল সে। 'ওই যে আমার স্বামী আসছে।'

ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। মাথার হ্যাট নামিয়ে বাউ করল দেফার্জকে। হেসে বলল, 'শুভদিন, মঁসিয়ে জ্যাক।'

থমকে দাঁড়াল দেফার্জ। সোজাসুজি তাকাল আগন্তুকের দিকে।

'কোথাও ভুল হয়েছে আপনার, মঁসিয়ে', বলল সে। 'আমাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছেন। আমার নাম জ্যাক নয়। আর্নেস্ট দেফার্জ।'

'ওই একই কথা', হেসে বলল আগন্তুক। 'আপনি জ্যাক বা দেফার্জ যে-ই হন, শুভদিন।'

'শুভদিন', শুকনো গলায় বলল দেফার্জ।

'মঁসিয়ে দেফার্জ, একটু আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মাদামকে বলছিলাম, বেচারা গ্যাসপার্ডের জন্য সেইন্ট অ্যান্তোইনবাসীরা ভীষণ খেপে গেছে। যখন-তখন একটা লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে যেতে পারে।'

মাথা নাড়ল দেফার্জ। 'কই, তেমন কিছু তো শুনি নি। আমার চাইতে আপনি এই এলাকার খবর বেশি রাখেন মনে হচ্ছে।'

'না, তা ঠিক নয়', বলল আগন্তুক। 'তবে এখানকার গরিবদের সম্পর্কে খুব জানবার ইচ্ছে আমার।'

'তাই নাকি?'

banglainternet.com

জবাব না দিয়ে আরেক গ্লাস মদ চাইল আগন্তুক। তারপর বলল, 'আপনার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে আমার, মঁসিয়ে দেফার্জ। আপনার সাবেক মনিবকে চিনি আমি। ডাক্তার ম্যানেটের কথা বলছি। ভদ্রলোকের মেয়ের সাথেও আলাপ হয়েছে। আজকাল ওদের খোঁজখবর তেমন রাখেন না, তাই না?'

'না।'

'মেয়েটা নাকি খুব শিগগিরই বিয়ে করতে যাচ্ছে, শুনেছেন?'

'না তো?' অবাক হয়ে বলল মাদাম দেফার্জ।

'কাকে?'

'মিস লুসির হবু স্বামী ইংরেজ নন। সে একজন ফরাসি। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গ্যাসপার্ড যাকে খুন করেছে সেই মার্কুইস অব এভরেমঁদের ভাইপোকে বিয়ে করতে যাচ্ছে ও। ছেলেটা ইংল্যান্ডের কোথাও থাকে। নাম চার্লস ডারনে।'

খবরটা শুনে মাদাম দেফার্জের মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। এক মনে উল বুনে চলেছে সে। তবে স্বামী বেচারার মধ্যে ভীষণ একটা প্রতিক্রিয়া হল। যার ছাপ তার চেহারায় ফুটে উঠল। ভেতরের অস্থিরতা লুকোবার জন্য পাইপ বের করল সে। আগুন ধরাতে গিয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার বিচলিত অবস্থা। হাতের কাঁপুনিটা চোখ এড়াল না গুপ্তচরের। সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে। মদের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বেশ কয়েকটা মিনিট কথা বলল না কেউ। দেফার্জ যেমনি দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। মাদাম যেমন উল বুনছিল তেমনি বুনে চলল।

অবশেষে দেফার্জ বলল, 'লোকটা যা বলে গেল তা কি সত্যি?'

'হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে', বলল মাদাম। 'তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'যদি সত্যি হয়—' শুরু করেই হঠাৎ থেমে গেল দেফার্জ।

'সত্যি হলে কী?' জিজ্ঞেস করল মাদাম দেফার্জ।

'যদি সত্যি হয়, আর আমরা বেঁচে থাকতে যদি বিপ্লব শুরু হয়, তা হলে মেয়েটার জন্য আমি প্রার্থনা করব, ওর নিয়তি যেন ওর স্বামীকে ফ্রান্স থেকে দূরে রাখে।'

'নিয়তির ওপর কারো হাত নেই', বলল মাদাম। 'ওর নিয়তিই ওকে যেখানে যাবার সেখানে নিয়ে যাবে। তবে তোমার মতো আমিও চাই, বিপ্লব শুরু হলে ও যেন ফ্রান্সে ফিরে না আসে। কারণ গতকালই ওর নামটা আমি বুনে ফেলেছি।'

সাত

ছ'বছর হয়ে গেল চার্লসের সাথে বিয়ে হয়েছে লুসির। কিন্তু আজো লুসি জানে না চার্লসের আসল পরিচয়। জানেন শুধু ডাক্তার ম্যানেট। বিয়ের দিন ডাক্তার ম্যানেটকে নিজের পরিচয় দিয়েছিল চার্লস। শুনে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন ডাক্তার ম্যানেট। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু পারেন নি শুধু মা-মরা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাই পরম শত্রুর ভাইপোকে মেয়েজামাই বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তবে চার্লসকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে যেন তার আসল পরিচয় লুসিকে না জানায়। এমনকি মিস্টার লরিকেও না। কথা রেখেছে চার্লস।

লন্ডনের সোহো পল্লীর এক বাড়িতে সুখের ঘর বেঁধেছে ওরা। ফুটফুটে একটা মেয়েও হয়েছে। মা-বাবা আদর করে ডাকে ছোট লুসি। এই তিন জনের সুখী পরিবার। তবে পরিবারের সদস্য না হয়েও আরো একজন অতি আপনজন আছে ওদের। তিনি হলেন মিস্টার জারভিস লরি। টেলসন'স ব্যাংকের কর্ণধার।

মিস্টার লরি ছাড়া আরো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে ওদের। সে হল সিডনি কারটন। তবে খুব কম আসে সে। ছোট্ট লুসির সাথে তার বেজায় ভাব। ছোট্ট লুসিও খুব পছন্দ করে তাকে। হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে কথা বলে কারটনের সঙ্গে।

কারটনের এই আসা-যাওয়াকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে লুসি। বিয়ের পর কারটন যখন প্রথম এই বাড়িতে এল, সেদিন চমকে উঠেছিল ও। কিন্তু চার্লস জানিয়েছিল উষ্ণ অভ্যর্থনা।

নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাবার পর চার্লসকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল কারটন। বলল, 'আমরা কি বন্ধু হতে পারি না, মিস্টার চার্লস?'

'যেদিন আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন সেদিন থেকেই তো আপনাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছি। আজ এতদিন পর এ কথা বলছেন কেন?'

'কারণ আছে, মিস্টার চার্লস। আমি লোক ভালো নই। মানুষ আমাকে লম্পট, চরিত্রহীন, মাতাল বলে জানে।' হঠাৎ গলাটা ধরে এল কারটনের। 'এ জগতে আমার কেউ নেই, মিস্টার চার্লস। কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই।'

'কে বলেছে আপনার যাবার জায়গা নেই? আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন। যখন খুশি আসবেন। আপনাকে আমরা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে জানি।'

banglainternet.com

'আমরা মানে?'

'আমি আর লুসি। লুসির কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।'

'কী শুনেছেন, মিস্টার চার্লস?'

'শুনেছি আপনি খুব ভালো লোক। মানুষের জন্য যা করেন নিঃস্বার্থভাবে করেন।'

'আর কী বলেছে?'

'আরো অনেক কথা। অন্যদিন শুনবেন। আবার আসছেন তো?'

'আসব। আপনার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি। কেউ আমার সাথে এভাবে কথা বলে না। আজ মনে হচ্ছে জগতে আমি একা নই। নিশ্চয়ই আসব, মিস্টার চার্লস।'

কথা রেখেছে সিডনি কারটন। তারপর থেকে গত ছ'বছরে অনেকবার এ বাড়িতে এসেছে সে। কথা রেখেছে লুসিও। সেই আলাপের কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলে নি ও।

এদিকে লুসি আর চার্লসের সংসারে যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কমতি নেই, ওদিকে ফ্রান্সের আকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। জনজীবনে গুমরে উঠেছে অসন্তোষ। বুঝতে পারল বিপ্লবীরা, অনেক দিনের জমে থাকা মেঘ এবার আর বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে না।

আট

প্যারিস।

জুলাই চৌদ্দ। সতের শ উননব্বই।

সকাল থেকেই দেফার্জের মদের দোকানের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে হাজারে হাজার হতশ্রী, ছিন্নমূল মানুষ। মুহুর্মুহুঃ স্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে তারা। অত্যাচারী রাজা-রানী নিপাত যাক। অভিজাত শ্রেণী নিপাত যাক। সবার হাতে অস্ত্র। যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটে এসেছে। ছোরা, বন্দুক, কোদাল, কুড়াল, বাঁশের লাঠি, লোহার ডাণ্ডা—কোনো কিছুই বাদ যায় নি। যে কিছুই পায় নি সে রাস্তার পাশ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে ইট বা পাথর। রক্ত চেপেছে যেন সেইন্ট আন্তোইনের প্রত্যেকটা নারী-পুরুষের মাথায়। উত্তেজনায় দপদপ করছে তাদের শিরা-উপশিরা। টকটকে লাল চোখে জ্বলজ্বল করছে প্রতিহিংসার আগুন।

দেফার্জের দোকানকে কেন্দ্র করে ঘুরছে উন্মত্ত জনতা। সকাল থেকেই ভীষণ ব্যস্ত দেফার্জ। কাউকে হুকুম দিচ্ছে, কাউকে অস্ত্র দিচ্ছে। কারো অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। কাউকে সামনে টানছে, কাউকে আবার হটিয়ে দিচ্ছে, কাউকে শাসন করছে—সব ব্যাপারেই দেফার্জ। চরকির মতো ঘুরছে সে। আর চিৎকার করছে, 'জ্যাক এক, তুমি আমার কাছে থাক। জ্যাক দুই, তুমি একটা দেশপ্রেমিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ কর। জ্যাক তিন, তুমি তোমার দলবল নিয়ে এগিয়ে যাও...,

অস্ত্র বিলি শেষ করে চারপাশে তাকাল দেফার্জ।

'আমার স্ত্রী কই?'

'এই যে এখানে। মেয়েদের নেতৃত্ব নিয়েছি আমি।'

আজ আর সেলাই করছে না মাদাম দেফার্জ। তার ডান হাতে একটা কুড়াল। কোমরবন্ধে ঝুলছে পিস্তল আর একটা ছোরা।

'এগিয়ে চল!' হাতের মুঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল দেফার্জ। 'দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ, আমরা প্রস্তুত। চল বাস্তিলের পথে।'

'চল! চল!' ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ল শত-সহস্র বিপ্লবী। পরমুহূর্তে একটা ঢেউ উঠল উন্মত্ত জনতার সাগরে। সামনে যা কিছু পেল সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল সেই ঢেউ বাস্তিলের দিকে।

ওদিকে তখন একটানা পাগলা ঘণ্টা বেজে চলেছে দুর্গে। তোরণে তোরণে বাজছে ঢোল। সতর্ক করা হচ্ছে কারারক্ষীদের। কিন্তু থামল না উন্মত্ত জনতার ঢল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাস্তিল দুর্গের ওপর। কারারক্ষীদের গুলিতে, কামানের গোলায় ঢলে পড়ল শত শত তাজা প্রাণ। তাদের রক্তের ওপর দিয়েই এগিয়ে গেল অন্যরা। গভীর পরিখা, টানা সেতু, নিরেট পাথরের দেয়াল—কোনো কিছুই থামাতে পারল না মুক্তিপাগল জনতাকে। মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করে, একের পর এক বাধা পেরিয়ে ঘিরে ফেলল দুর্গটাকে। টানা গাড়িতে করে খড় আনা হল। সেই খড়ে আগুন ধরিয়ে ঠেলে দেওয়া হল দেয়ালের দিকে। মশাল জ্বালিয়ে ছুড়ে মারা হল দুর্গের ভেতর। দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ার আড়ালে হারিয়ে গেল দুর্গের বেশিরভাগ অংশ।

এভাবেই কেটে গেল ঘণ্টা দুয়েক। বিন্দুমাত্র হতাশা আসে নি বিপ্লবীদের মনে। অটুট মনোবল তাদের। দেফার্জকে তো চেনাই যাচ্ছে না। বারুদে কালো হয়ে গেছে আপাদমস্তক। ঠিক পেশাদার গোলন্দাজের মতো দক্ষ হাতে কামান দেগে চলেছে। আর উৎসাহ দিচ্ছে সঙ্গীদের।

'শাবাশ! বন্ধুগণ। এগিয়ে চল। ভেঙে দাও। গুঁড়িয়ে দাও।'

মাদাম দেফার্জও কম যাচ্ছে না। প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে সে-ও। একটু পরপরই

BanglaInternet.com

চিৎকার করে উঠছে, 'মেয়েরা! দেখিয়ে দাও। তোমরাও পুরুষের চেয়ে কম নও। দেখিয়ে দাও, তোমরাও লড়তে জান।'

কেটে গেল আরো দুটো ঘণ্টা। বিপ্লবীদের মুহুর্মুহুঃ আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়েছে কারারক্ষীরা। চারপাশে অস্ত্রের ঝনৎকার আর লাখো জনতার গর্জন শুনে বুকে কাঁপন ধরেছে তাদের। আক্রমণের চেয়ে প্রতিরক্ষার কাজেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা।

অবিরাম কামান দেগে চলেছে বিপ্লবীরা। হঠাৎ এক গোলার আঘাতে শেকল ছিঁড়ে নেমে এল একটা টানা সেতু। খুশিতে চিৎকার করে উঠল বিপ্লবীরা। ঝড়ের বেগে সেতু পেরিয়ে ঢুকে পড়ল দুর্গে। সামনে যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। যা কিছু পেল তাতেই আগুন ধরাল।

নিরুপায় হয়ে সাদা নিশান ওড়াল কারারক্ষীরা। পতন হল বাস্তিল দুর্গের। ফরাসি সরকারের অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ। যার রুদ্ধ কক্ষগুলোতে বছরের পর বছর ধরে গুমরে কেঁদেছে বন্দি মানুষের নিরুদ্ধ বেদনা।

টানা সেতুগুলো সব নামিয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে ভরে গেল দুর্গ প্রাঙ্গণ। ধাক্কা খেতে খেতে ভেতরে ঢুকল দেফার্জ। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। কাছেই দেখতে পেল জ্যাক তিনকে। অস্ত্র উঁচিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাদাম দেফার্জকে দেখা গেল একটু দূরে। একদল মেয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

এরই মধ্যে দুর্গের কর্মকর্তা আর রক্ষীদের এনে জড়ো করা হয়েছে চত্বরে। তাদের অস্ত্রপাতি সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শাসানো হচ্ছে, কোনো রকম চালাকির চেষ্টা করা হলে হত্যা করা হবে।

দু হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল দেফার্জ। এক কারা-কর্মকর্তার কলার চেপে ধরে বলল, 'এক শ পাঁচ উত্তর টাওয়ারে নিয়ে চল আমাকে। জলদি।'

'যাচ্ছি!' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল লোকটা। 'কিন্তু ওই সেলে কেউ নেই এখন।'

'না থাকুক। পথ দেখাও।'

'আসুন, মঁসিয়ে।'

একটা জ্বলন্ত মশাল উঁচিয়ে ধরে কক্ষের পর কক্ষ, দরজার পর দরজা পেরিয়ে এগিয়ে চলল কারা-কর্মকর্তা। পেছনে দেফার্জ আর জ্যাক তিন। বার কয়েক ডানে-বাঁয়ে মোড় নিয়ে প্রায়ান্ধকার একটা করিডোরে পৌঁছল ওরা। করিডোরের মাথায় খাড়া সিঁড়ি। ওপরে উঠল সেই সিঁড়ি বেয়ে। এগোল কিছু দূর। আবার নিচে নামা। আবার হাঁটা। অবশেষে একটা দরজার সামনে এসে থামল কর্মকর্তা। দরজাটা বন্ধ। তবে তালা নেই। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে বলল, 'এই হল এক শ পাঁচ উত্তর টাওয়ার।'

দেফার্জ আর জ্যাক তিনও ঢুকল ভেতরে।

ছোট্ট একটা কুঠরি। দেয়ালগুলো কালচে হয়ে গেছে। এক পাশে একটা চিমনি। তার নিচে চুল্লি। অন্যপাশে একটা টুল, একটা টেবিল আর একটা খড়ের বিছানা।

'মশালটা আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে নাও', কারা-কর্মকর্তাকে আদেশ করল দেফার্জ। 'দেয়ালগুলো ভালো করে দেখতে চাই।'

নিঃশব্দে আদেশ পালন করল কারা-কর্মকর্তা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাতে লাগল দেফার্জ।

'থাম!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে। 'এদিকে এস, জ্যাক। দেখ, কী লেখা রয়েছে এখানে। আলেকজান্ডার ম্যানেট।'

এগিয়ে এসে নামটা পড়ল জ্যাক। 'হ্যাঁ, তাই।'

'নামের নিচে কী লেখা দেখ, এক হতভাগ্য চিকিৎসক। আর কোনো সন্দেহ নেই। এ লেখা তিনিই লিখেছেন। পাথরে আঁচড় কেটে দিন তারিখের হিসাবও রেখেছিলেন। তোমার হাতে কী ওটা, জ্যাক। শাবল? দাও তো এদিকে।'

শাবলের দু-তিন আঘাতেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল ঘুণে ধরা টুল আর টেবিল।

'টুকরোগুলো ভালো করে দেখ, জ্যাক। বিছানাটাও কেটে দেখ। কিছু থাকতে পারে খড়ের ভেতর।'

এবার চিমনির গায়ে আঘাত করতে শুরু করল দেফার্জ। কয়েক ঘা মারতেই খসে পড়ল চুন-সুরকির টুকরো। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল সেগুলো। তারপর একটা গর্ত করে হাত ঢুকিয়ে দিল চিমনির ভেতর। হাতটা নাড়াচাড়া করতেই কী যেন ঠেকল আঙুলে। কাগজের মতো মনে হল। হ্যাঁ তাই। একতাড়া কাগজ। মুঠো করে বের করে আনল তাড়াটা। দ্রুত চালান করে দিল পকেটে। তারপর ঘুরে তাকাল জ্যাক তিনের দিকে।

'পেলে কিছু?'

'না।'

'চল তা হলে।'

বেরিয়ে গেল ওরা। দুর্গ প্রাঙ্গণে হাঁকডাক করে দেফার্জকে খুঁজছে বিপ্লবীরা। বাস্তিলের গভর্নরকে আটক করেছে তারা।

উর্দি পরা এক বৃদ্ধকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্মত্ত জনতা। দেফার্জকে দেখেই চিৎকার করে উঠল মাদাম দেফার্জ। 'এর নির্দেশেই গুলি চালিয়েছে রক্ষীরা। কী শাস্তি দেওয়া হবে একে?'

নিজের গলার কাছে হাত নিয়ে পোঁচ দেওয়ার ভঙ্গি করল দেফার্জ। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপ্লবীরা। টুঁ শব্দটি করারও সুযোগ পেল না গভর্নর

banglainternet.com

বেচারা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার নিষ্প্রাণ দেহ। মাদাম দেফার্জ এগিয়ে এল এবার। মৃত গভর্নরের বুকের ওপর একটা পা রেখে দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে হাতের ছোরাটা ঘ্যাঁচ করে চালিয়ে দিল মৃতদেহের গলায়। দু-তিন পোঁচেই আলাদা হয়ে গেল মুণ্ড। খুশিতে চিৎকার করে উঠল বিপ্লবীরা।

'ওই লণ্ঠনটা নামিয়ে আন কেউ', পথের পাশে একটা খুঁটির দিকে তাকিয়ে বলল মাদাম দেফার্জ।

দৌড়ে গেল একজন। খুঁটি থেকে নামিয়ে আনল লণ্ঠনটা। সেই লণ্ঠনের সাথে বেঁধে দেওয়া হল গভর্নরের রক্তঝরা মুণ্ড। লণ্ঠনটা আবার তুলে দেওয়া হল খুঁটির মাথায়। বাতাসে দোল খেতে লাগল মুণ্ডটা।

নিচে উল্লাসে ফেটে পড়ল জনসমুদ্র। যুগের পর যুগ অত্যাচারিত, অপমানিত আর বঞ্চিত জনতার সেই প্রতিহিংসা লেখা হয়ে রইল রক্তের অক্ষরে।

এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল মাদাম দেফার্জ। জ্বলে উঠল ফরাসি বিপ্লবের আগুন। এবার আর লাল মদে নয়। রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে সেইন্ট আন্তোইনের পথঘাট।

বিপ্লবের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ফরাসি দেশ। উগ্র থেকে উগ্রতর হতে লাগল বিপ্লবীরা। কঠিন আঘাত হানল তারা রাজপ্রাসাদে, সম্পদ-ফেনিল উচ্ছ্বসিত জীবনে।

মার্কুইস অব এভরেমঁদের জমিদারিও রক্ষা পেল না বিপ্লবীদের রোষানল থেকে। এক রাতে আগুন লাগল শ্যাতোয়। গ্রামের লোকজন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখল সেই আগুন। আর এ ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'আগুনটা চল্লিশ ফুট উঁচুতে উঠেছে তো?'

নয়

লন্ডন।

সতের শ বিরানব্বই। তিনটি বছর পেরিয়ে গেছে ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হবার পর। দিন বদলের সাথে সাথে বেড়ে গেছে টেলসন'স ব্যাংকের ব্যস্ততা। প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক পালিয়ে আসছে লন্ডনে। এদের মধ্যে রয়েছে জমিদার, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, অভিজাত শ্রেণী। কোনোমতে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছে এরা। এসেই প্রথমে যোগাযোগ করে টেলসন'স ব্যাংকের লন্ডন শাখায়। এদের অনেকেরই হিসাব ছিল প্যারিস শাখায়। পুরোনো সম্পর্কের সূত্রে ঋণ দেওয়া হয় তাদের। অনেকে আসে নতুন ঋণ পাবার আশায়। কেউ আবার আসে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সেই আশায়। পলাতক ফরাসিমাত্রই জানে, লন্ডনে তাদের সম্মিলন স্থান হচ্ছে এই টেলসন'স ব্যাংক। পলাতক কোনো ফরাসিকে চিঠিপত্র দিতে হলে এখানেই আসে প্রথম। তাই সর্বশেষ খবর বা চিঠিপত্রের আশায় প্রতিদিনই ভিড় জমায় তারা। বিশেষ কোনো খবর থাকলে ব্যাংক তা কাগজে লিখে সেঁটে দেয় জানালার সাথে।

এক পড়ন্ত বিকেলে নিজের ডেস্কে বসে আছেন মিস্টার জারভিস লরি। পাশেই দাঁড়ানো চার্লস ডারনে। নিচু স্বরে আলাপ করছে দুজন।

'এই পরিস্থিতিতে আপনার ফ্রান্স যাওয়া ঠিক হবে না', বলল চার্লস।

'কেন? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি?'

'না। আমি ঠিক তা বোঝাতে চাই নি। আমি বলতে চাইছি যে প্যারিস এখন আপনার জন্য নিরাপদ নয়।'

'দেখ চার্লস, আমি একে তো ব্রিটিশ। তার ওপর আবার আশি বছরের বুড়ো। আমাকে মারবে কেন ওরা?'

'তা হলে আমিও যাব আপনার সাথে', বলল চার্লস।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি তো ফরাসি। তোমাকে হাতে পেলে ছেড়ে দেবে ওরা?'

'ফরাসি বলেই তো যেতে চাইছি। ফরাসি ছাড়া হতভাগ্য ফরাসিদের ব্যথা বুঝবে কে?'

'তোমার কিছু হলে লুসির কী হবে ভেবে দেখেছ? ওর জন্য যাওয়া চলবে না তোমার। বাচ্চাটার কথাও ভেবে দেখ।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি না আমি। কিন্তু আপনিও যেতে পারবেন না।'

'আমার ব্যাপারটা ভিন্ন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ব্যাংকে একজন অভিজ্ঞ লোক থাকা দরকার। অতি জরুরি কিছু কাগজপত্র হেফাজত করতে হবে। ওগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে ব্যাংকের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ষাট বছর ধরে কাজ করছি এই প্রতিষ্ঠানে। আজ এই উপকারটুকু করতে পারব না?'

'তা হলে কি একাই যাচ্ছেন? না কাউকে সঙ্গে নেবেন?'

জেরি যাবে সাথে...

মিস্টার লরির কথা শেষ না হতেই এক কর্মচারী ঢুকল কক্ষে। একটা খাম রাখল টেবিলে। খামের ওপর প্রাপকের নাম-ঠিকানা দেখে চমকে উঠল চার্লস। মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল। লেখাগুলো ইংরেজি করলে দাঁড়ায় :

banglainternet.com

অতি জরুরি

মার্কুইস সেইন্ট এভরেমঁদ অব ফ্রান্স

প্রযত্নে : মেসার্স টেলসন'স অ্যান্ড কোং, ব্যাংকারস, লন্ডন

'প্রাপকের কোনো খোঁজ পেলেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল কর্মচারী।

'না', বললেন মিস্টার লরি। 'এখানে যারা আসা-যাওয়া করে তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ চেনে না এই ভদ্রলোককে।'

'আমি চিনি', খামটার দিকে তাকিয়ে বলল চার্লস। 'আমি পৌঁছে দেব।'

'তবে তো ভালোই হল', বলতে বলতে খামটা তুলে দিলেন চার্লসের হাতে।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল চার্লস। নির্জন একটা জায়গায় এসে চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

অ্যাবি কারাগার, প্যারিস
জুন ২১, ১৭৯২

মঁসিয়ে,

আমি আজ কারাগারে বন্দি। আমার অপরাধ আমি নাকি আপনার নির্দেশে জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করেছি। এই অপরাধে আমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। আপনি যতদিন মার্কুইস ছিলেন ততদিন প্রজাদের কাছ থেকে কোনো রকম খাজনা আদায় করা হয় নি। কিন্তু কেউ আমার কোনো কথা শুনছে না। শুধু বলে, আমি একজন দেশত্যাগীর পক্ষে কাজ করছি। ওরা আমার ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনাদের শ্যাতোও জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আমি জানি, আমার একমাত্র অপরাধ আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি। আশা করি আপনিও আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।

মঁসিয়ে, আপনার কাছে আমার মিনতি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। এই নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন।

আপনার বিশ্বস্ত
গ্যাবেল

চিঠিটা পড়ে মুষড়ে পড়ল চার্লস। এভরেমঁদ জমিদারির এক বিশ্বস্ত কর্মচারী আজ বিনা অপরাধে দণ্ডিত হতে যাচ্ছে। ওর নির্দেশেই জমিদারি আগলে রেখেছিল বেচারা। এই হল তার অপরাধ। আজ প্রভুর অপরাধে ভৃত্যের প্রাণ যেতে বসেছে।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল চার্লস, নিরপরাধ গ্যাবেলকে বাঁচাতে হবে। প্যারিস যেতে হবে ওকে। যে কোনো উপায়েই হোক, মুক্ত করতে হবে গ্যাবেলকে।

ব্যাংকে ফিরে এল চার্লস। একটা গাড়ি দেখতে পেল ব্যাংকের সামনে। জেরি ক্রাঞ্চার অপেক্ষা করছে পাশে। ভেতরে ঢুকে দেখল, মিস্টার লরিও তৈরি বেরুবার জন্য।

'চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছি', বলল চার্লস। 'লিখিত কোনো জবাব দেন নি উনি। তবে মৌখিক একটা সংবাদ পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছেন আপনাকে। পারবেন?'

'পারব', বললেন মিস্টার লরি। 'যদি বিপজ্জনক কিছু না হয়।'

'বিপজ্জনক কিছু নয়। অ্যাবি কারাগারে এক বন্দিকে একটা খবর পৌঁছে দিতে হবে।'

'নাম কী লোকটার?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'গ্যাবেল।'

'খবরটা কী?'

'মামুলি খবর। বলতে হবে, তিনি খবর পেয়েছেন। খুব শিগগিরই আসবেন।'

'ঠিক আছে', দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন মিস্টার লরি। 'খবরটা পৌঁছে যাবে গ্যাবেলের কাছে।'

গভীর রাতে দুটো চিঠি লিখল চার্লস। লুসিকে একটা। অন্যটা ডাক্তার ম্যানেটকে। দুটো চিঠিতেই প্যারিস যাওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে জানাল।

পরের দিনটা খুব কষ্টে কাটাল চার্লস। মনের কথা কাউকে না বলার কষ্ট। সন্ধ্যার পর বাচ্চাটার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভাবখানা যেন একটু হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছে চিঠি দুটো দিয়ে অনুরোধ করল, সে যেন মাঝরাতের কিছু আগে ডাক্তারের বাড়িতে চিঠি দুটো পৌঁছে দেয়।

ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়ে চমকে উঠল চার্লস। চমকে ওঠার কথাই। এ যেন অন্য রকম ফ্রান্স। অচেনা ফ্রান্স। গ্রামের মুখে মুখে, শহরের তোরণে তোরণে চৌকি। পাহারায় লাল টুপি সশস্ত্র বিপ্লবী। সবাইকে থামাচ্ছে তারা। জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কাগজপত্র পরীক্ষা করছে। তারপর ইচ্ছে হলে ফিরিয়ে দেয়, নয়তো এগিয়ে যেতে বলে। সবই চলে তাদের মরজিমাফিক। এই হল সতের শ বিরানব্বই সালের নতুন ফরাসি সাধারণতন্ত্রের চেহারা।

এই রকম গোটা বিশেক চৌকি পেরিয়ে এক সরাইখানায় পৌঁছল চার্লস। ক্লান্ত শরীর। খেয়েদেয়ে শোবার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে হঠাৎ এক ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, এক অফিসারের সাথে দুই বিপ্লবী দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। সবার মাথায় লাল টুপি। হাতে অস্ত্র।

'ওদের সাথে প্যারিস যেতে হবে তোমাকে', বলল অফিসার। 'ওরা তোমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাবে। তবে এজন্য পথখরচ দিতে হবে।'

banglainternet.com

'আমি তো প্যারিসেই যাচ্ছি', বলল চার্লস। 'একাই যেতে পারব। রক্ষী লাগবে না।'

'চুপ!' গর্জে উঠল এক রক্ষী। পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিল বিছানায়। 'একদম চুপ। আমরা যা বলব তাই হবে।'

ভয়ে আর কথা বলল না চার্লস। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওদের সাথে। ওখান থেকে একটা চৌকিতে নিয়ে যাওয়া হল ওকে। বেশ কয়েকজন বিপ্লবী দেখতে পেল সেখানে। সবার মাথায় লাল টুপি। কেউ ধূমপান করছে, কেউ মদ খাচ্ছে, কেউবা আগুনের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেক বসে রইল সেখানে। ভোররাতে চার্লসকে ঘোড়ায় চাপিয়ে রওনা হল দুই অশ্বারোহী। চার্লসের আগে চলল একজন। আরেকজন পেছনে।

সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত চলল ওরা। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আবার পথ চলা। আবার বিশ্রাম। অবশেষে বিকেলের দিকে পৌঁছল বোভেয়া শহরে।

সশস্ত্র দুই লাল টুপি অশ্বারোহী থাকায় নিজেকে নিরাপদই ভাবছিল চার্লস। পথে কোনো ঝামেলা হয় নি। চৌকিতেও থামতে হয় নি। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল শহরে পৌঁছামাত্র।

ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল ওদের ঘিরে। চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন, 'ধর ওকে! ধর দেশত্যাগীকে।'

'না না। আমি দেশত্যাগী নই, বন্ধুগণ।' বলল চার্লস। 'আমি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে এসেছি।'

'তুই নিশ্চয়ই দেশত্যাগী', চিৎকার করে উঠল এক কামার। লোহা-পেটানো হাতুড়ি নিয়ে তেড়ে এল।

দ্রুত এক বৃদ্ধ ছুটে এল। দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল। বলল, 'হোক ও দেশত্যাগী। দেখছ না রক্ষীরা ওকে প্যারিস নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে ওর বিচার হবে।'

'বিচার হবে!' ভেংচি কাটার মতো করে বলল কামার। হাতুড়িটা দোলাতে লাগল বাতাসে। যেন কল্পনায় কাউকে আঘাত করছে। 'নিশ্চয়ই দেশদ্রোহের অভিযোগে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিচার হবে', সমস্বরে চিৎকার করে উঠল জনতা। 'দেশদ্রোহের অভিযোগে বিচার হবে।'

'ভুল করছ তোমরা, বন্ধুরা', শান্তভাবে বলল চার্লস। 'আমি দেশদ্রোহী নই।'

'ফের মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল কামার। 'নতুন আইন অনুযায়ী নিশ্চয়ই তুই দেশদ্রোহী। এখানেই তোর বিচার করব আমরা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেশদ্রোহী', কামারের সঙ্গে সুর মেলাল জনতা। এগিয়ে আসছে তারা। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে চার্লসের ওপর। কিন্তু সে সুযোগ দিল না বৃদ্ধ। ছোঁ মেরে চার্লসের হাত থেকে লাগামটা কেড়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের সরাইখানার প্রাঙ্গণে। দুই রক্ষীও ঢুকে পড়ল ওদের পেছনে। মুহূর্তের মধ্যেই আবার ছুটে এল বৃদ্ধ। বন্ধ করে দিল লোহার ফটক। বাইরে কিছুক্ষণ হম্বিতম্বি করল জনতা। ইটপাটকেল ছুড়ল বন্ধ ফটকের ওপর। তারপর চলে গেল।

গভীর রাতে সরাইখানা থেকে বেরুল চার্লস আর দুই রক্ষী। রওনা হল রাজধানীর পথে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম চলার পর সকালে পৌঁছল প্যারিসের উপকণ্ঠে। বিপ্লবীদের বড় একটা চৌকি রয়েছে এখানে। থামতে হল ওদের।

'বন্দির কাগজপত্র কোথায়?' জানতে চাইল চৌকির এক কর্মকর্তা।

'বন্দি!' বিস্ময় ফুটে উঠল চার্লসের কণ্ঠে। 'আমি বন্দি নই। ফরাসি নাগরিক। এই দুই রক্ষী আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছে। এজন্য টাকা দিয়েছি ওদের।'

'কোথায় কাগজপত্র?' এক রক্ষীর দিকে তাকিয়ে আবার বলল কর্মকর্তা।

মাথার টুপি খুলে একটা চিঠি বের করল রক্ষী। 'এই নিন।'

গ্যাবেলের লেখা চিঠিটা পড়তে পড়তে কপালে ভাঁজ পড়ল কর্মকর্তার। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চার্লসের দিকে। তারপর দুই রক্ষীকে উদ্দেশ করে বলল, 'খেয়াল রেখ ওর দিকে।' ভেতরে চলে গেল সে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর ফিরল কর্মকর্তা। চার্লসকে আদেশ করল, 'এস আমার সাথে।' একটু এগিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। রক্ষীদেরকে বলল, 'তোমরা এবার যেতে পার। বন্দি এখন থেকে আমাদের জিম্মায় থাকবে।'

চার্লসকে নিয়ে চৌকিঘরে ঢুকল লোকটা। মদের গন্ধ আর তামাকের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে রয়েছে ঘরের বাতাস। বেশ ক'জন বিপ্লবী সৈনিক দেখা গেল সেখানে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। কেউ জেগে, কেউ ঘুমিয়ে। এক পাশে একটা ডেস্ক। ডেস্কের পেছনে রুক্ষ চেহারার এক কর্মকর্তা।

'দেফার্জ', চার্লসকে নিয়ে যে লোকটা ঘরে ঢুকেছে তার দিকে তাকিয়ে বলল চৌকি-কর্মকর্তা। 'এই তা হলে দেশত্যাগী এভরেমঁদ।'

'হ্যাঁ', বলল দেফার্জ।

'তোমার স্ত্রী কোথায়?'

'লন্ডনে।'

'তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দি, এভরেমঁদ। তোমাকে লা ফোর্স কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'আমার অপরাধ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল চার্লস।

'নতুন আইন করেছি আমরা', ক্রূর হাসি হেসে বলল চৌকি-কর্মকর্তা। 'অপরাধের তালিকাও নতুনভাবে করা হয়েছে।'

banglainternet.com

'দয়া করে আমার কথাগুলো একটু শুনুন', অনুনয় ঝরে পড়ল চার্লসের কণ্ঠে। 'আমার এক ভাই একটা চিঠি লিখেছে আমাকে। আপনার সামনে রাখা ওই চিঠিটা। সে আমার সাহায্য চেয়েছে। তাকে সাহায্য করতেই আমার ফ্রান্সে আসা। নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা করার অধিকার আছে আমার?'

'না! দেশত্যাগীদের কোনো অধিকার নেই।' দেফার্জের দিকে তাকাল কর্মকর্তা। 'নিয়ে যাও বন্দিকে।'

দশ

বিশাল এক বাড়ির একাংশ নিয়ে টেলসন'স ব্যাংকের প্যারিস শাখা। এককালে নাম করা এক অভিজাতের বাড়ি ছিল ওটা। বিপ্লব শুরু হলে নিজের চাকরের ছদ্মবেশে পালিয়ে যান ভদ্রলোক। তখন থেকেই বিপ্লবীদের দখলে চলে যায় বাড়িটা। এর চারদিকে রয়েছে উঁচু প্রাচীর। মজবুত লোহার ফটক। এক কথায় নিরাপত্তার দিক থেকে বাড়িটা সুরক্ষিত। এজন্যই প্যারিসে এলে ও বাড়িতেই ওঠেন মিস্টার লরি। তিনি ইংরেজ। বিদেশী। সুতরাং বিপ্লবের এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মাঝখানেও তিনি খানিকটা নিরাপদ। মিস্টার লরির এখানে ওঠার আরেকটা কারণ আছে। তা হল ব্যাংকের কাছাকাছি থাকা। কখন কী ঘটে যায় ঠিক নেই।

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ। নির্জন ঘর। আগুনের পাশে বসে রয়েছেন মিস্টার লরি। ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাঁকে। একটু পরপরই বাইরে থেকে ভেসে আসছে বিপ্লবীদের হাঁকডাক, চিৎকার। অনেকক্ষণ ধরে শুনছেন। তারপর হঠাৎই যেন কানে এল অন্য রকম একটা আওয়াজ। কেমন ঘড়ঘড়ে। যান্ত্রিক। কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু বুঝতে পারলেন না কিসের শব্দ। শেষে উঠে দাঁড়ালেন। জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিলেন।

যা দেখলেন তাতে চোখ কপালে উঠল তাঁর। বাড়ির প্রাঙ্গণে, দুটো খুঁটির সাথে বাঁধা দুটো জ্বলন্ত মশাল। তার নিচে, দুই খুঁটির মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শান দেওয়ার পাথর। হাতল ঘোরাবার সাথে সাথে বনবন করে ঘুরছে পাথরের চাকতি। নিষ্ঠুর চেহারার এক লোক শানিয়ে দিচ্ছে অস্ত্রগুলো। লোকজন আসছে আর যাচ্ছে। সবার হাতেই কোনো-না-কোনো অস্ত্র। তলোয়ার, ছোরা, বর্শা, আরো কত কি। মানুষ কেটে কেটে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। আর অমনি ছুটে আসছে শান দেওয়ার জন্য। তাদের হাতে রক্ত, কাপড়ে রক্ত, হাতিয়ারে রক্ত। দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠলেন মিস্টার লরি। ফিরে এসে বসলেন আগুনের পাশে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল ব্যাংকের সদর দরজার ঘণ্টা। চমকে উঠলেন মিস্টার লরি। কে এল এত রাতে, ভাবলেন তিনি। ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভালো। দিনে-রাতে পালা করে পাহারা দেয় বিশ্বস্ত রক্ষীরা, ভয়ের কিছু নেই। হয়তো কোনো হতভাগা মক্কেল। রাতের অন্ধকারে টাকা নিতে এসেছে। হয়তো পালাবার কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছে। উঠে পা বাড়ালেন তিনি। এমন সময় খুলে গেল দরজা। দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন মিস্টার লরি। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লুসি আর ডাক্তার ম্যানেট। দুজনের মুখই পাংশু। দু বাহু বাড়িয়ে ছুটে এল লুসি। জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

'কী ব্যাপার?' চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার লরি। 'তোমরা এখানে কেন? কী হয়েছে!'

'কাউকে কিছু না বলে প্যারিস চলে এসেছে চার্লস', বলল লুসি। 'ও চলে আসার পর একটা চিঠি পাই। সেই চিঠি থেকে সব জানতে পেরেছি।'

ভেতরে এল সবাই। এমন সময় আবার হৈ-হট্টোড়ের শব্দ ভেসে এল প্রাঙ্গণ থেকে।

'কিসের শব্দ?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

'যেও না, ডাক্তার। যেও না।' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার লরি।

থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার ম্যানেট। দু হাত কোমরে রেখে গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন, 'বন্ধু, আমি আঠারটা বছর বন্দি ছিলাম বাস্তিল কারাগারে। আমার নাম সবাই জানে। বাস্তিল বন্দির গায়ে হাত তোলে এমন বিপ্লবী আজো জন্মে নি প্যারিসে। আমি জানতাম আমাকে সম্মান করবে বিপ্লবীরা। সে সম্মান ইতোমধ্যেই পেয়েছি। তাই তো বিনা বাধায় একের পর এক চৌকি পেরিয়ে এসেছি। শুধু তা-ই নয়, চার্লসের খবরাখবরও সংগ্রহ করেছি।'

'কোথায় আছে চার্লস?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'লা ফোর্স কারাগারে', বললেন ডাক্তার ম্যানেট।

নামটা শুনে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেন মিস্টার লরি। কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। লুসির দিকে ফিরলেন তিনি। বললেন, 'আমার পেছনের ঘরটায় গিয়ে বস। তোমার বাবার সাথে কিছু গোপন কথা আছে আমার।'

ডাক্তারের মুখোমুখি বসলেন মিস্টার লরি। বললেন, 'লা ফোর্স বড় কঠিন জায়গা, ডাক্তার। ওখানে একবার কেউ ঢুকলে জীবন নিয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। চার্লসের জন্য যদি কিছু করতে চাও তা হলে এক্ষুনি শুরু কর। বিপ্লবীরা বেশি সময় দেয় না। কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই হল, ব্যাস, শুরু হয়ে

BanglaInternet.com

গেল বিচার। বলতে পার বিচারের নামে অবিচার। জজ আর জুরিরা বসেই আছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য। তারপর গিলোটিন তো পাতাই আছে। যাও, ডাক্তার। লুসি আমার এখানেই থাকুক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ম্যানেট। তখনো প্রায় শ দুয়েক লোক রয়েছে প্রাঙ্গণে। ঠেলাঠেলি করছে কে কার আগে শান দেবে। একজনের শেষ হলেই আরেকজন বাড়িয়ে দিচ্ছে অস্ত্র। পাগলের মতো শান-যন্ত্রের হাতল ঘোরাচ্ছে লোকটা। বনবন করে ঘুরছে পাথরের চাকতি। অস্ত্রের সংস্পর্শে আসামাত্র তীর বেগে ছিটকে বেরুচ্ছে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ। এক মুহূর্ত বিরাম নেই লোকটার। মেয়েরা বোতল থেকে মদ ঢেলে দিচ্ছে তার মুখে। চাঙ্গা রাখছে তাকে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন মিস্টার লরি, দৃঢ় পায়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার ম্যানেট। কাছাকাছি গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন। কী যেন বললেন। চট করে ঘুরে দাঁড়াল বিপ্লবীরা। এগিয়ে এল জনাকয়েক। হাত নেড়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন ডাক্তার।

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বিপ্লবীরা, 'বাস্তিলের বন্দি দীর্ঘজীবী হোক। বাস্তিল-বন্দির আত্মীয়ের মুক্তি চাই। চল, চল। লা ফোর্সে চল।' বৃদ্ধ ডাক্তারকে কাঁধে তুলে নিল বিপ্লবীরা। ছুটে চলল কারাগারের দিকে।

জানালা বন্ধ করে লুসির কাছে এলেন মিস্টার লরি। ছোট্ট লুসি ঘুমিয়ে রয়েছে বিছানায়। মিস প্রস ওর পাশে শোয়া। সে-ও ঘুমিয়ে।

একটা চেয়ার টেনে লুসির পাশে বসলেন মিস্টার লরি। শোকাতুর দৃষ্টি মেলে একবার তাকাল লুসি। তারপর মুখ ভার করে বসে রইল। কেউ ঘুমাল না সেই রাতে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়ে দিল সারা রাত।

পরদিন দুপুরেও ফিরলেন না ডাক্তার ম্যানেট। ভাবনায় পড়লেন মিস্টার লরি। একজন দেশত্যাগীর স্ত্রীকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। বিপ্লবীরা জানতে পারলে ব্যাংকের ওপর হামলা করে বসতে পারে। তার নিজের যে কোনো ক্ষতি তিনি মেনে নেবেন। কিন্তু তাঁর কারণে ঐতিহ্যবাহী টেলসন'স ব্যাংকের সুনাম তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না। তাই দেরি না করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ব্যাংকের কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া করলেন ওদের জন্য। তারপর ফিরে এসে লুসি, মিস প্রস আর ছোট্ট লুসিকে নিয়ে গেলেন সেই বাড়িতে। ওদের থাকা-খাওয়া, আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন ব্যাংকে। জেরি ক্রাঞ্চারকে পাঠিয়ে দিলেন দেখাশোনার জন্য।

দিনের বাকি সময়টুকু ব্যাংকেই কাটালেন মিস্টার লরি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। ব্যাংক বন্ধ করে ঘরে এসে বসলেন। এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। কয়েক মুহূর্ত পর এক লোক ঢুকল ঘরে।

'আমার নাম আর্নেস্ট দেফার্জ', বলল লোকটা। 'আপনি কি মিস্টার জারভিস লরি?'

'হ্যাঁ। কী চাই তোমার?'

'আমি ডাক্তার ম্যানেটের কাছ থেকে এসেছি। একটা চিঠি আছে আপনার।'

মিস্টার লরির হাতে একটা চিরকুট তুলে দিল দেফার্জ। ডাক্তার ম্যানেটের নিজ হাতে লেখা। তিনি লিখেছেন, 'চার্লস ভালো আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে আসতে পারছি না।'

খবরটা লুসিকে জানানো দরকার, ভাবলেন তিনি। দেফার্জকে বিদায় করে উঠে দাঁড়ালেন।

চার দিন পর ফিরলেন ডাক্তার ম্যানেট। এই চার দিনে লা ফোর্সে যা ঘটতে দেখেছেন তার কিছুই জানালেন না লুসিকে। শুধু বললেন, 'চার্লস ভালো আছে।'

কারাগারের রোমহর্ষক সব ঘটনা শোনালেন মিস্টার লরিকে। এক হাজার বন্দিকে হত্যা করা হয়েছে এই চার দিনে। বিচারসভা বসেছে কারাগারের ভেতরেই। বিচারকেরা গায়ের জোরেই বিচারক হয়ে বসেছে। একজন একজন করে কয়েদি আনা হয় তাদের সামনে। অভিযোগ পড়ে শোনানো হয়। দু-একজন সাক্ষী ডাকা হয়। বেশিরভাগ সাক্ষীই আসামিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। গম্ভীর মুখে শোনেন বিচারক। তারপর রায় ঘোষণা করেন। আসামি দোষী সাব্যস্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বধ্যভূমিতে। অনেক সময় পৌঁছতেও পারে না। তার আগেই জনতা তাদের ছিনিয়ে নেয় রক্ষীদের হাত থেকে। তারপর কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। দু-চারজন যে মুক্তি পাচ্ছে না তা নয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।

এমনি এক বিচারসভায় গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন ডাক্তার ম্যানেট। জুরিদের মধ্যে ছিল তাঁর সেকালের ভৃত্য দেফার্জ। আদালতের সামনে জামাতার পক্ষে অনেক কিছুই বললেন তিনি। অনেক কারণ দেখালেন। যেসব কারণে ওর মুক্তি পাওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য শুনে আদালতে হাজির করা হল চার্লস ডারনেকে। শুনানি শুরু হবে এমন সময় হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। জুরিরা কিছুক্ষণ কানাঘুষা করল নিজেদের মধ্যে। তারপর আদেশ দেওয়া হল, 'চার্লস ডারনেকে এখন মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। ওকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হবে। যাতে উন্মত্ত জনতা ছিনিয়ে নিতে না পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা জানালেন ডাক্তার ম্যানেট, যতদিন উন্মত্ত জনতা কারাগারের সামনে থেকে চলে না যায় ততদিন যেন তাকে কারাগারে থাকতে দেওয়া হয়। বাস্তিলবন্দি হিসেবে মঞ্জুর করা হল প্রার্থনা।

চার দিন পর ফিরে গেল জনতা। এই চার দিনে আরো কত রোমহর্ষক ঘটনা

banglainternet.com

ঘটতে দেখেছেন ডাক্তার ম্যানেট। সব বর্ণনা করলেন মিস্টার লরিকে। শুনতে শুনতে বারবার শিউরে উঠলেন মিস্টার লরি।

কোর্টে গেল দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দেখতে দেখতে চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ডাক্তার ম্যানেটের। সবারই চিকিৎসা করেন তিনি। ধনী-গরিব, বিপ্লবী-অবিপ্লবী। অবশেষে লা ফোর্সসহ তিনটা কারাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত করা হল তাঁকে। শুধু চিকিৎসক বলে নয়, বাস্তিলবন্দির মর্যাদাও তাঁকে এ কাজ পেতে সাহায্য করল। ফলে চার্লসের সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার দেখা করার সুযোগ হল তাঁর। চার্লসও সুযোগ পেল লুসিকে খবর পাঠাবার।

এক বছর তিন মাস কেটে গেল এভাবে। না হল চার্লসের বিচার, না মুক্তি। ও রকম তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় নতুন শাসকদের? নতুন যুগ এসেছে, নতুন নতুন আইন হয়েছে। সব ভেঙেচুরে যাচ্ছে। ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। রাজার বিচার হচ্ছে। পরমুহূর্তেই তার খণ্ডিত মাথা ধুলায় লুটোচ্ছে ঘাতকের আঘাতে। সারা দেশ ভেসে যাচ্ছে ধ্বংসের বন্যায়। সুতরাং তুচ্ছ চার্লসের খবর কে রাখে?

তাই বলে হাল ছাড়েন নি ডাক্তার ম্যানেট। থেমে নেই তাঁর চেষ্টা। শেষে এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন তিনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। কাল বিচার শুরু হবে চার্লসের।

এগার

পরদিন।

চার্লসের আগে পনের জন বন্দির বিচার হল। সবারই মৃত্যুদণ্ড। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, পনের জন বন্দির বিচার করতে সময় লাগল মাত্র দেড় ঘণ্টা।

জুরিদের মধ্যে আজ আর দেফার্জ নেই। সে আজ দর্শকের সারিতে। মিস্টার লরি এবং ডাক্তার ম্যানেটও রয়েছেন দর্শকদের মধ্যে।

শুরু হল বিচার। চার্লসকে দেশত্যাগী বলে অভিযুক্ত করল সরকারি উকিল। নতুন আইন অনুযায়ী এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কল্লা চাই ওর', সমস্বরে চিৎকার করে উঠল দর্শকরা। 'প্রজাতন্ত্রের শত্রুদের ক্ষমা নেই।'

হাতুড়ি পেটালেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। চুপ হয়ে গেল জনতা।

'দীর্ঘদিন ধরে তুমি ইংল্যান্ডে বসবাস করছ, কথাটা কি ঠিক?' আসামির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন সভাপতি।

'হ্যাঁ।'

'তারপরও তুমি দেশত্যাগী নও বলতে চাও?'

'নতুন আইনের অধীনে আমি দেশত্যাগী নই। আমি অনেক আগেই মার্কুইসের উপাধি ত্যাগ করেছি। কারণ ওই উপাধিকে আমি ঘৃণা করি। আর আমি দেশত্যাগ করেছিলাম বিপ্লবীদের ভয়ে নয়। দেশের গরিব জনসাধারণের পয়সায় বেঁচে থাকার চাইতে ইংল্যান্ডে নিজের উপার্জনে জীবনধারণ বেশি ভালো মনে হয়েছিল আমার কাছে।'

'তুমি যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ?'

'দুজন সাক্ষী আছে আমার। একজন মঁসিয়ে গ্যাবেল, অন্যজন ডাক্তার ম্যানেট।'

'তুমি তো ইংল্যান্ডে বিয়ে করেছ, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন সভাপতি।

'হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটা ইংরেজ নয়।'

'তবে?'

'ফরাসি। জন্মসূত্রে।'

'নাম কী? কার মেয়ে?'

'লুসি ম্যানেট। ডাক্তার ম্যানেটের মেয়ে। তিনি এখন এখানেই আছেন।'

ম্যানেটের নাম শুনতেই খুশির একটা স্রোত বয়ে গেল আদালত-কক্ষে। কিছুক্ষণ আগেও যারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল চার্লসের দিকে, তাদের চোখেমুখেও ফুটে উঠল প্রসন্ন অভিব্যক্তি।

'ফ্রান্সে কেন ফিরে এলে?' জিজ্ঞেস করলেন সভাপতি।

'ফরাসি নাগরিক গ্যাবেলের একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তার প্রাণ রক্ষার জন্যই এসেছি। এটা কি আমার অপরাধ?'

'না।' চিৎকার করে উপস্থিত জনতা।

'নাগরিক গ্যাবেলের চিঠিটা দেখাও আমাকে', বললেন সভাপতি।

'চিঠিটা আমার অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে চৌকিতে রেখে দেওয়া হয়েছে।'

টেবিলের ওপর রাখা কতকগুলো কাগজপত্র ঘেঁটে একটা চিঠি বের করলেন সভাপতি। পড়লেন। তারপর নাগরিক গ্যাবেলকে ডাকলেন।

'নাগরিক গ্যাবেল, এ চিঠি তোমার লেখা?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে। অ্যাবি কারাগারে থাকার সময় লিখেছিলাম। তিন দিন আগে মুক্তি পেয়েছি আমি।'

banglainternet.com

এর পর প্রশ্ন করা হল ডাক্তার ম্যানেটকে। ডাক্তার ম্যানেটের জনপ্রিয়তা এবং স্পষ্ট জবাব প্রত্যাবিত করল জুরিদের। তিনি বললেন, 'বাস্তিল থেকে মুক্তি পাবার পর চার্লসকেই তিনি প্রথম বন্ধু হিসেবে পান। ইংল্যান্ডের অভিজাত শাসকশ্রেণীর সুনজরে ছিল না ও। একবার ইংল্যান্ডের শত্রু হিসেবে অভিযুক্ত করে বিচার করা হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক—মিস্টার জারভিস লরি। তিনি এখন এখানেই আছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে উনাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'দরকার নেই', বলল জুরিরা। 'যথেষ্ট হয়েছে।'

তারপর এক এক করে সিদ্ধান্ত জানাতে শুরু করল তারা। দর্শকরা হাত তুলে অনুমোদন করল জুরিদের সিদ্ধান্ত। অবশেষে রায় ঘোষণা করলেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। 'আসামি নির্দোষ। তাকে মুক্তি দেওয়া হোক।'

ডাক্তার ম্যানেটের মুখে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ হাসি। আর মিস্টার লরির নেই আনন্দের সীমা।

কেটে গেল আরো কয়েকটা মাস। এখনো প্যারিস ছাড়ে নি চার্লস। এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি করতে চায় না ও। পাছে বিপ্লবীদের সন্দেহ হয়।

এক সন্ধ্যায় নাতনির সঙ্গে গল্প করছিলেন ডাক্তার ম্যানেট। লুসি আর চার্লস পাশের ঘরে। ফ্রান্স থেকে কবে, কীভাবে বেরুবে তারই শলাপরামর্শ করছে। মিস প্রস গেছে টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে। জেরি ক্রাঞ্চারকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

নানা–নাতনির গল্প বেশ জমে উঠেছে এমন সময় দুপদাপ পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। তার কয়েক মুহূর্ত পরই দরজায় দুমদাম ঘা।

ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে ছুটে এল লুসি। 'বাবা চার্লসকে বাঁচাও।'

'ভয় নেই, মা', বললেন ডাক্তার ম্যানেট। 'আমি আগেও ওকে বাঁচিয়েছি।'

একটা লণ্ঠন তুলে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজা খুললেন। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল চার বিপ্লবী। মাথায় লাল টুপি। রুক্ষ চেহারা। কোমরে পিস্তল।

'চার্লস ডারনে কোথায়?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল একজন।

'কে খুঁজছে আমাকে', ডাক্তার ম্যানেটের পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল চার্লস।

'আমি', বলল সেই লোকটা। 'আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি, এভরেমঁদ। আদালতে দেখেছি। আবার তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

'কেন? কী করেছি আমি?'

'সেটা আদালতে জানতে পারবে। এখন চল আমাদের সঙ্গে।'

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন ডাক্তার ম্যানেট। নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন। হাতের লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেলেন বন্ডার দিকে। বললেন, 'আমাকে চেন তুমি?'

'হ্যাঁ, নাগরিক ডাক্তার। আমরা সবাই চিনি আপনাকে।'

'তা হলে ওকে গ্রেপ্তার করছ কেন?'

'সেইন্ট আন্তোইনের লোকেরা অভিযোগ এনেছে ওর বিরুদ্ধে।'

'কিসের অভিযোগ?'

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, নাগরিক ডাক্তার। আমাদের তাড়া আছে।'

'একটু দাঁড়াও', বললেন ডাক্তার ম্যানেট। 'কে অভিযোগ করেছে ওর বিরুদ্ধে? নামটা বল আমাকে।'

'ঠিক আছে। যদিও নিয়মের বাইরে তবু বলছি। নাগরিক দেফার্জ আর মাদাম দেফার্জ। আরো একজন আছে।'

'কে সে?' দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার ম্যানেট।

অদ্ভুত এক দৃষ্টি ফুটে উঠল লোকটার চোখে। 'এর জবাব কাল দেব, ডাক্তার ম্যানেট। এস এভরেমঁদ।'

এসবের কিছুই জানতে পারে নি মিস প্রস। প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে মদের দোকানে ঢুকল ও। সঙ্গে রয়েছে জেরি ক্রাঞ্চার। মিস প্রসকে দেখে কোণের টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল এক লোক। মুখটা যথাসম্ভব আড়াল করে এগোল দরজার দিকে। কিন্তু তাকে দেখে ফেলল মিস প্রস।

'সলোমন!' চিৎকার করে ডাকল ও। 'কত দিন পর তোমার দেখা পেলাম!'

'আমাকে সলোমন বলে ডেক না', ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে উঠল লোকটা। 'আমার মরণ ডেকে আনতে চাও নাকি?'

'সলোমন, ভাই আমার', প্রায় কেঁদে ফেলল মিস প্রস। পানিতে ভরে গেল দু চোখ। 'এমন কথা বলতে পারলে?'

'তা হলে দয়া করে মুখটা বন্ধ কর', বলল সলোমন। 'কিছু বলার থাকলে বাইরে এস। সঙ্গের ওই লোকটা কে?'

'জেরি ক্রাঞ্চার', কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল মিস প্রস। 'টেলসন'স ব্যাংকের দারোয়ান।'

মদের দাম মিটিয়ে বাইরে এল ওরা। তিন জনই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মিস প্রস বলল, 'আপন বোনের সঙ্গে এ কী রকম ব্যবহার তোমার, সলোমন?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সলোমন। কিন্তু তার আগেই জেরি ক্রাঞ্চার বলল, 'তোমার নাম কি জন সলোমন না সলোমন জন?'

ঝট করে জেরির দিকে ফিরল সলোমন। চোখে সন্দেহ।

'কী বলতে চাও তুমি?'

BanglaInternet.com

'বলছিলাম তোমার নাম যে সলোমন তাতে সন্দেহ নেই', বলল জেরি। 'কারণ তোমার বোন তোমাকে ওই নামেই ডেকেছে। অথচ আমি জানি তুমি জন। তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। ওল্ড বেইলিতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় জনের সাথে কী নাম ব্যবহার করেছিলে তুমি?'

'বরসাদ', পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল।

পঁই করে ঘুরে দাঁড়াল তিন জন। সিডনি কারটন দাঁড়িয়ে রয়েছে পেছনে। মুখে স্মিত হাসি।

'ভয় পেয়ো না, মিস প্রস', বলল কারটন। 'কাল সন্ধ্যায় পৌঁছেছি প্যারিসে। তোমার ভাইয়ের সাথে কিছু কথা আছে। অবশ্য উনি একজন গুপ্তচর না হলে কথা বলার দরকার ছিল না।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বরসাদের চেহারা। 'মিথ্যে কথা।' প্রতিবাদ করল সে।

'আমি জানি তুমি গুপ্তচর', বলল কারটন। 'ঘণ্টাখানেক আগে তোমাকে কনসিয়ারগেরি কারাগার থেকে বেরুতে দেখেছি। খুব অবাক হয়েছিলাম তোমাকে ওখানে দেখে। তারপরই তোমার পিছু নিই। এই দোকানে বসে তোমার সাথে যারা মদ খাচ্ছিল তাদের দু-চারটা কথা শুনেই বুঝতে পারি তুমি একজন গুপ্তচর। তখনই আমি ভাবতে শুরু করি তোমাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়।'

'কাজে লাগাবে? আমাকে?'

'ব্যাপারটা গোপনীয়', বলল জেরি। 'এখানে আলাপ না করাই ভালো। চল টেলসন'স ব্যাংকে যাই।'

'ভয় দেখাচ্ছ? কোথাও যাব না তোমার সঙ্গে।'

'তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

খানিক ইতস্তত করল বরসাদ। 'বেশ। চল।'

মিস প্রসকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ব্যাংকে গেল ওরা। বাড়িতেই পাওয়া গেল মিস্টার লরিকে। বরসাদকে দেখে ভীষণ অবাক হলেন তিনি।

পরিচয় করিয়ে দিল কারটন। 'মিস প্রসের ভাই। মিস্টার বরসাদ।'

'বরসাদ?' ভুরু কুঁচকে বললেন মিস্টার লরি। 'নামটা যেন শুনেছি আগে। চেহারাটাও চেনা চেনা লাগছে।'

'ওল্ড বেইলিতে চার্লসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল', বলল কারটন। 'মিস প্রসের অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া ভাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'একটা দুঃসংবাদ আছে। চার্লসকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'হোয়াট!' প্রায় লাফিয়ে উঠলেন মিস্টার লরি। 'দু ঘণ্টা আগেও তো দেখে এলাম। কোথায় নেওয়া হয়েছে ওকে?'

'কনসিয়ারগেরি কারাগারে।'

'ওখানে আমাদের বন্ধুবান্ধব কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'নেই!' বলল কারটন। 'তবে হতে কতক্ষণ?'

'মানে?'

'ইচ্ছে করলে মিস্টার বরসাদই আমাদের সাহায্য করতে পারে।'

'আমার সাহায্য পেতে হলে খুব উঁচুদরের তাস থাকতে হবে তোমাদের হাতে।'

'তা আমাদের আছে, মিস্টার বরসাদ', বলল কারটন। 'ঘণ্টাখানেক আগে তোমাকে কনসিয়ারগেরি কারাগার থেকে বেরুতে দেখেছি। অর্থাৎ আজ তুমি ফরাসি পুলিশের গুপ্তচর। প্রজাতন্ত্রীয় পরিষদের গোপন সংবাদবাহক। অথচ একসময় তুমি ছিলে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর। আমার তো মনে হয় তুমি এখনো ব্রিটিশদের পক্ষেই কাজ করছ। মিস্টার বরসাদ, এখন যদি প্রজাতন্ত্রীয় পরিষদের কাছে গিয়ে বলি, তুমি আসলে ইংল্যান্ডের গুপ্তচর, ফ্রান্সের শত্রু, কেমন হবে? এই মুহূর্তে তোমার মাথাটা চলে যাবে গিলোটিনের তলায়। এবার বল, আমার তাসগুলো কি তোমার চেয়ে খারাপ?'

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল বরসাদের। বুঝতে পারল, সিডনি কারটনের কথা শুনতেই হবে। শুনলে হয়তো প্রাণ বাঁচতেও পারে। আর না শুনলে অবধারিত মৃত্যু। অসহায় দৃষ্টিতে কারটনের দিকে তাকাল বরসাদ। 'কী করতে হবে তোমাদের জন্য?'

'খুব বেশি কিছু না', বলল কারটন। 'তুমি তো যখন খুশি কনসিয়ারগেরিতে ঢুকতে পার, তাই না?'

'তা পারি।'

'তা হলে এস।' উঠে দাঁড়াল কারটন। 'পাশের ঘরে বসে নিরিবিলি দুটো কথা বলি। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমার জন্য।'

বার

পরদিন।

আদালতকক্ষে ঢুকে চারপাশে চোখ বুলাল বরসাদ। মিস্টার লরি পৌঁছে গেছেন আগেই। ডাক্তার ম্যানেটও। লুসিকে দেখা গেল বাবার পাশে।

কাঠগড়ায় আনা হল চার্লসকে। প্রত্যেকটা চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল পাঁচ বিচারকের ওপর। সবার মুখে কঠোর অভিব্যক্তি।

banglainternet.com

অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়াল সরকারি উকিল। অভিযোগগুলো পড়তে শুরু করল :

'এভরেমঁদ—অর্থাৎ চার্লস ডারনেকে কয়েক মাস আগে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আবার গত কাল তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, সে প্রজাতন্ত্রের শত্রু এবং এমন এক অভিজাত পরিবারের সন্তান, যে পরিবারের বিরুদ্ধে জনগণের রয়েছে অসংখ্য অভিযোগ।'

'অভিযোগ কি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে নাকি গোপনে?' জিজ্ঞেস করলেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

'প্রকাশ্যেই।'

'কে এনেছে?'

'তিন জন। আর্নেস্ট দেফার্জ। সেইন্ট আন্তোইনের এক মদের দোকানি।'

'আর?'

'থেরেসি দেফার্জ। আর্নেস্ট দেফার্জের স্ত্রী।'

'আরেক জন?'

'আলেকজান্ডার ম্যানেট। চিকিৎসক।'

মহা হইচই পড়ে গেল আদালতকক্ষে। এই হট্টগোলের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার ম্যানেট। কাঁপছেন থর থর করে।

'মিথ্যে কথা, মাননীয় সভাপতি', হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'বন্দি আমার মেয়ের স্বামী। কে বলে আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি। প্রমাণ আছে?'

'আছে, ডাক্তার ম্যানেট।' উঠে দাঁড়িয়ে বলল দেফার্জ। সভাপতির দিকে তাকাল সে। 'অনুমতি দিলে আমি এখনই হাজির করতে পারি।'

'অনুমতি দেওয়া হল', গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সভাপতি।

'আমি জানতাম', শুরু করল দেফার্জ। 'ডাক্তার ম্যানেট একসময় উত্তর টাওয়ারের এক শ পাঁচ নম্বর কুঠরিতে বন্দি ছিলেন। বাস্তিল পতনের পর ওই কুঠরিতে যাই আমি। চিমনির ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজ উদ্ধার করি। ডাক্তার ম্যানেটের নিজ হাতে লেখা কিছু কথা আছে এতে। লেখাটা যে ডাক্তারের তা আমি প্রমাণ করতে পারব। এই যে কাগজগুলো।'

'পড়া হোক', আদেশ দিল সভাপতি।

পিন পতন নীরবতার মধ্যে পড়তে শুরু করল দেফার্জ :

'আমি, আলেকজান্ডার ম্যানেট, সতের শ সাতষট্টি সালের ডিসেম্বর মাসে বাস্তিলের এক অন্ধকার কুঠরিতে বসে লিখছি এ কাহিনী। লেখাটা চিমনির ভেতর লুকিয়ে রাখার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছি। আশা করি আমার মৃত্যুর পর কেউ এটা উদ্ধার করে জানতে পারবে অনেক না জানা কথা। আমি শপথ করে বলছি, এই কাগজে যা লেখা হয়েছে তার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি।

'সতের শ সাতান্ন সালের ডিসেম্বর মাস। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত। সিন নদীর তীর ধরে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি দ্রুতবেগে একটা গাড়ি ছুটে আসছে পেছন থেকে। ঝট করে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় শুনতে পেলাম, কে যেন চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলছে কোচোয়ানকে।

'আমাকে ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে থামল গাড়ি। একই কণ্ঠস্বরে আমার নাম ধরে ডাকল কেউ। এগিয়ে গেলাম। দু ভদ্রলোক নামল গাড়ি থেকে। দুজনই বয়সে যুবক। চেহারায়ও যথেষ্ট মিল। দু ভাই মনে হল।

'তুমি ডাক্তার ম্যানেট, তাই না?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'জি।'

'তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। গাড়িতে ওঠ।'

'নীরবে ওদের নির্দেশ পালন ছাড়া উপায় ছিল না আমার। ওরা ছিল সশস্ত্র। তাই বাধা না দিয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। আগের মতোই ঝড়ো গতিতে ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

'শহর ছাড়িয়ে গ্রামে এলাম আমরা। নির্জন একটা বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। ওপরের ঘর থেকে ভেসে আসছিল একটানা গোঙানির শব্দ। সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। জ্বরের ঘোরে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে একটা মেয়ে। মেয়েটা যুবতী। অপূর্ব সুন্দরী। মাথায় এলোমেলো চুল। পোশাকআশাক ছেঁড়া। হাত দুটো দু পাশে বাঁধা।

'বুনো দৃষ্টি ফুটে উঠেছে মেয়েটার দু চোখে। একটু পরপরই চিৎকার করে উঠছে : আমার স্বামী, আমার বাবা, আমার ভাই...। এভাবেই চলতে লাগল।

'কতক্ষণ যাবৎ চলছে এ রকম?' জানতে চাইলাম।

'গত রাত থেকে', বলল দু ভাইয়ের বড় জন।

'কী দিয়ে ওর চিকিৎসা করব? আমার সঙ্গে ওষুধপত্র নেই।'

'তাতে কী?' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ছোট ভাই। 'আমাদের কাছে আছে।' আলমারি খুলে ওষুধের একটা বাক্স বের করল সে।

'কয়েকটা ওষুধ মিলিয়ে খাইয়ে দিলাম মেয়েটাকে। অবশ্য খাওয়াতে খুব কষ্ট হল। কিছুতেই গিলতে চাইছিল না। বিছানার পাশে বসে ওষুধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছি, এমন সময় বড় ভাই বলল, আরেক জন রোগী আছে বাড়িতে।

'চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তার অবস্থাও কি এ রকম?'

'আগে দেখ', তাচ্ছিল্যের সাথে বলল বড় ভাই।

'বাতি হাতে আমাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল ওরা। মেজের ওপর কিছু খড় বিছানো। তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা ছেলে। বয়স বড়জোর ষোল। ডান হাতে খামচে ধরে আছে বুক। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ছাদের দিকে। প্রথমে বুঝতে পারি নি কী হয়েছে। বুকের ওপর থেকে হাতটা সরাবার পর দেখতে

BanglaInternet.com

পেলাম ক্ষতটা। তলোয়ারের আঘাত। বেশ গভীরে চলে গেছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। শিগগিরই মারা যাবে ছেলেটা।

বড় ভাইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে হল?'

'ছোকরাটা একটা পাগলা কুকুর। আমার ভাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল।'

লোকটার গলা শুনে আস্তে আস্তে ঘুরে তাকাল ছেলেটা। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কি ওকে দেখেছ, ডাক্তার?'

'দেখেছি।'

'ও আমার বোন। আমরা ওই লোকটার প্রজা। আমার বোনের বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরই ওই লোকটার কুনজর পড়ে আমার বোনের ওপর। প্রাসাদে আসতে বলে। আমার বোন ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তারপর দু ভাই মিলে আমার বোনের স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন ওদের নির্যাতনে একদিন মারা গেল সে। ওরা এসে ধরে নিয়ে যায় আমার বোনকে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে আমার মাথায়। গত রাতে একটা তলোয়ার যোগাড় করে ছুটে আসি এখানে। কিন্তু আমি হলাম চাষার ছেলে। অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত। শিক্ষিত, তলোয়ারবাজের সাথে পারি নি আমি। তবুও লড়েছিলাম কিছুক্ষণ।

'কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে ছেলেটা। দম নেওয়ার জন্য একটু থামল। মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখলাম ওর মুখে।

'আমাকে একটু তোল, ডাক্তার', হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ছেলেটা। 'কোথায় সেই শয়তানটা!'

'আস্তে আস্তে মাথাটা উঁচু করলাম ছেলেটার। আমার হাঁটুর ওপর রাখলাম। বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল ছেলেটা। মুঠো পাকিয়ে, শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে বলল, মার্কুইস, তোমার বংশের শেষ সন্তানটিকে পর্যন্ত এই নিষ্ঠুরতার কৈফিয়ত দিতে হবে। আমার বুকের রক্ত দিয়ে লিখে রেখে গেলাম।

'প্রাণপণে একবার উঠে বসার চেষ্টা করল ছেলেটা। তারপর ঢলে পড়ল। আস্তে করে নামিয়ে রাখলাম মাথাটা।

'আবার এলাম মেয়েটার ঘরে। তখনো গোঙাচ্ছে মেয়েটা। ওর যন্ত্রণা কমাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম।

'মার্কুইস ঢুকল কক্ষে। 'মারা গেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না', জবাব দিলাম। 'তবে খুব একটা দেরিও নেই।'

'ডাক্তার, আমার ভাইয়ের এই বিপদ দেখে আমিই এদের চিকিৎসা করানোর পরামর্শটা দিয়েছিলাম। তোমার বয়স কম। এরই মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছ। ভবিষ্যতে আরো উন্নতি করবে। সুতরাং এখানে যা দেখলে, তা শুধু দেখলেই। কারো কাছে বলতে পারবে না।

'মার্কুইস যে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য কথাগুলো বলেছে তা আমার বুঝতে অসুবিধা হল না। আর এখানে এসে যা দেখলাম এবং শুনলাম তাতেও ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই খুব হিসাব করে জবাব দিলাম : মঁসিয়ে, পেশায় আমি ডাক্তার। রোগীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

'আমার জবাব শুনে চলে গেল মার্কুইস। মেয়েটার দিকে মনোযোগ দিলাম। নাম জিজ্ঞেস করলাম। পরিচয় জানতে চাইলাম। কিন্তু কিছুই বলল না মেয়েটা। বালিশের ওপর রাখা মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল শুধু। ঘণ্টাখানেক পর মারা গেল মেয়েটা।

'নিচের ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল দু ভাই। খবরটা জানালাম তাদের।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার', বলল মার্কুইস। 'ধন্যবাদ।'

'আমাকে একটা স্বর্ণমুদ্রা ভরা চামড়ার থলে দিল সে। থলেটা নিলাম। তবে রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছি, কিছুই নেব না ওদের কাছ থেকে।

'মাফ করবেন, মঁসিয়ে। আমি কিছু নিতে পারব না।'

'কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দু ভাই। কথা বলল না কেউ। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল কোচোয়ান।

'পরদিন। আমার বাড়ির সামনে ছোট একটা বাক্স পেলাম। বাক্সের ওপরে আমার নাম লেখা। ভেতরে পাওয়া গেল সেই স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলেটা। ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। অনেক চিন্তাভাবনার পর শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, পুরো ঘটনাটা লিখিতভাবে মন্ত্রীকে জানাব। তবে আমার স্ত্রীর কাছে সব গোপন রাখলাম।

'পরদিন খুব ভোরে উঠে চিঠিটা লিখতে শুরু করলাম। সবেমাত্র শেষ করেছি, এমন সময় এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার বাড়িতে। মার্কুইস সেইন্ট এভরেমঁদের স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, মূল ঘটনাটা তিনি জানেন। তবে হতভাগ্য মেয়েটা যে মারা গেছে তা জানেন না। একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশে তিনি ব্যথিত হলেন। গোপনে মেয়েটাকে সাহায্য করতে চাইলেন। আমি কিছু বললাম না। তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম, বছর তিনেকের একটা ছেলে বসে রয়েছে গাড়িতে।

'শুধু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার সাধ্যমতো করব মেয়েটার জন্য, বললেন ভদ্রমহিলা। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওর বাপ-চাচার এই পাপের জন্য একদিন চরম মূল্য দিতে হবে ওকে।

'আদুরে হাতে ছেলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন ভদ্রমহিলা। গালে একটা চুমু খেলেন। তারপর আবার বললেন, মায়ের কথামতো চলবে তো, চার্লস?

'চলব, মা।'

BanglaInternet.com

'চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। আর কখনো দেখি নি তাঁকে। সেদিনই চিঠিটা পৌঁছে দিলাম মন্ত্রীর দপ্তরে।

'সেই রাতেই ন'টার দিকে এক লোক এল আমার বাড়িতে। আর্নেস্ট দেফার্জ নামে এক ছোকরা কাজ করত আমার বাড়িতে। সে-ই দরজা খুলে লোকটাকে নিয়ে এল আমার কাছে।

'লোকটা বলল, সেইন্ট অ্যাবিতে একজন রোগীর খুব খারাপ অবস্থা। আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'নিচে নামলাম। সবেমাত্র বাইরে পা দিয়েছি, অমনি পেছন থেকে আচমকা একটা মাফলার এসে পড়ল আমার মুখের ওপর। মুখটা বেঁধে ফেলা হল। হাত দুটোও বাঁধা হল। সেই মুহূর্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু ভাই। মার্কুইস তার পকেট থেকে আমার লেখা সেই চিঠিটা বের করল। আমাকে দেখাল। বলল, এটাই তো মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়েছিলে, তাই না? তারপর লণ্ঠনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলল চিঠিটা।

'ভয় ছিল মার্কুইসের। তার এ অত্যাচারের কাহিনী আমি হয়তো একদিন প্রকাশ করে দেব। দণ্ডের ভয় না থাকুক, কলঙ্কের ভয় তার ছিল। তাই সেই রাতেই বাস্তিলের অন্ধকার কুঠরিতে পোরা হল আমাকে।

'দশটা বছর আমি আমার স্ত্রীর কোনো খোঁজ পাই নি। সে বেঁচে আছে না মরেছে তাও জানি না। শুধু এটুকু জানি, এ লোকগুলো ঈশ্বরের কাছে কখনো ক্ষমা পাবে না।

'আমি, আলেকজান্ডার ম্যানেট অভিশাপ দিচ্ছি ওদের এবং ওদের পরবর্তী বংশধরদের, ওরা যেন...

ডাক্তার ম্যানেটের লেখা বিবরণীটি পড়া শেষ হতেই ভয়ঙ্কর গর্জনে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা। চার্লস ডারনের রক্ত চাইছে তারা।

জুরিদের একেকটা ভোটও যেন একেকটা গর্জনের মতো শোনা গেল। গর্জনের পর গর্জন।

জামাতার পক্ষে তবুও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার ম্যানেট। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না আদালত। এভরেমঁদ বংশের যে পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ তাঁর লিখিত অভিযোগে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে তাঁর কোনো কথাই আর কেউ শুনতে চাইল না। তিনি কি জানতেন—একদিন রাগে, দুঃখে এভরেমঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের বিবরণী তিনি লিখেছিলেন, সেই বিবরণীই আজ প্রাণপ্রিয় মেয়ের স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে?

জুরিদের সঙ্গে একমত হলেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। রায় ঘোষণা করলেন তিনি, 'চার্লস ডারনে বংশগতভাবে একজন অভিজাত। সে প্রজাতন্ত্রের শত্রু। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক।'

চার্লসকে নিয়ে গেল রক্ষীরা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সিডনি কারটন। মিস্টার লরির কাছে এসে বলল, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। কিছু জরুরি কাজ আছে আমার। কাজগুলো সেরে সন্ধ্যায় দেখা করব ব্যাংকে।'

ঘুরতে ঘুরতে দেফার্জের মদের দোকানে পৌঁছল কারটন। ডানে-বাঁয়ে একবার তাকিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। মদের অর্ডার দিল।

কাউন্টারে বসে উল বুনছিল মাদাম দেফার্জ। কারটনের কথা বুঝতে না পেরে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কী চায় সে।

আগের মতোই মদের অর্ডার দিল কারটন।

'আপনি ইংরেজ?' বিস্ময়ের ছাপ পড়ল মাদামের মুখে।

ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে জবাব দিল কারটন, 'হ্যাঁ, মাদাম। আমি ইংরেজ।'

টেবিলের ওপর এক গ্লাস মদ রেখে কাউন্টারের পেছনে চলে গেল মাদাম দেফার্জ। স্বামীর কানে ফিসফিস করে বলল, 'একেবারে চার্লসের মতো দেখতে।'

'কিছুটা', বলল দেফার্জ।

'কিছুটা নয়। অনেকখানি। ভালো করে তাকিয়ে দেখ।'

জ্যাক তিন দাঁড়ানো ছিল কাছেই। হেসে বলল, 'এভরেমঁদের কথা তুমি একদম ভুলতে পারছ না, তাই না মাদাম?'

এরই মধ্যে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মনোযোগ দিয়ে পড়ার ভান করল কারটন। তবে কান খাড়া।

সেদিকে তাকিয়ে বলল মাদাম, 'কক্ষনো না। ওই দুই এভরেমঁদ ভাই যে কৃষক পরিবারের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল সেটা আমার পরিবার। আহত ছেলেটা ছিল আমার ভাই। মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটা ছিল আমার বড় বোন। সেই গরিব কৃষক পরিবারের আমিই একমাত্র অবশিষ্ট প্রাণী। আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক জেলেপল্লীতে। সেখানে বড় হতে লাগলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমার ভাইবোনের হত্যার প্রতিশোধ নেবই নেব। যেমন করেই হোক, মার্কুইসের বংশ নির্মূল করে ছাড়ব। চার্লস সেই অত্যাচারী এভরেমঁদের ভাস্তে। সুতরাং ওর মৃত্যু চাই-ই চাই।'

'আমিও', বলল জ্যাক তিন। 'আমরা সবাই।'

'কিন্তু সমস্যা হল আমার স্বামীকে নিয়ে', বলল মাদাম দেফার্জ। 'ও একসময় ডাক্তারের বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। ডাক্তার ওকে ভীষণ স্নেহ করত। ছেলেবেলার সেই স্মৃতি এখনো ভুলতে পারে নি।' দেফার্জের দিকে ফিরল মাদাম। 'সম্ভব হলে ডাক্তারের মেয়ে-জামাইকে বাঁচিয়ে দিতে, তাই না?'

'না', প্রতিবাদ করল দেফার্জ।

BanglaInternet.com

কয়েকজন খদ্দের ঢুকল এমন সময়। চুপ হয়ে গেল ওরা। কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলল কারটন। মদের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেল। মিস্টার লরির বাড়ির দিকে হেঁটে চলল।

বাড়িতে পাওয়া গেল মিস্টার লরিকে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। কারটনকে দেখে পায়চারি থামালেন তিনি।

'সব শেষ', ধরা গলায় বললেন মিস্টার লরি। 'রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছে ডাক্তার। সরকারি উকিলের সাথেও কথা বলেছে। কিন্তু সবারই এক কথা। জুরিদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' আবার পায়চারি শুরু করলেন মিস্টার লরি। বসে রইল কারটন। কিছুক্ষণ পর পায়চারি থামিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি, 'ডাক্তারের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সারা দিন পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। যেখানে তিলমাত্র সহানুভূতি পাওয়ার আশা আছে সেখানেই গেছে। সবার দরজায় দরজায় ঘুরেছে। এই কয়েক সপ্তায় কত লোকের উপকার করেছে সে। কিন্তু আশ্চর্য কেউ আজ তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে রাজি হল না। বেপরোয়া বিপ্লবীদের ভয়ে সবাই লেজ গুটিয়ে ফেলেছে। চার্লসকে আর বাঁচানো গেল না।'

'ডাক্তার এখন কোথায় আছেন', জিজ্ঞেস করল কারটন।

'কারো কাছে গেছে হয়তো। আবার আসবে বলে গেছে।'

মাঝরাতের দিকে ফিরলেন ডাক্তার ম্যানেট। উস্কখুস্ক চুল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন চারপাশে। কী যেন খুঁজছেন। কেউ কিছু বলার আগেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'না, কিছু হয় নি। কিছু করতে পারি নি। কেউ কোনো আশা দেয় নি।' হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার ম্যানেট। গায়ের কোটটা খুলে ছুড়ে ফেললেন। তারপর আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার বেঞ্চটা কোথায়? জুতা সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলো কোথায়? কোথায় সেগুলো?'

আকাশ ভেঙে পড়ল মিস্টার লরির মাথায়। পুরোনো পাগলামি ফিরে এসেছে ডাক্তারের। আবার তার মন চলে গেছে এক শ পাঁচ উত্তর টাওয়ারে।

ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দেওয়া হল ডাক্তার ম্যানেটকে। সেইসাথে আশ্বাস দেওয়া হল, তাঁর জুতা সেলাইয়ের সবকিছু এনে দেওয়া হবে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে। তারপর কথা বলল কারটন, 'উনাকে বাসায় পৌঁছে দিন, মিস্টার লরি।' বলতে বলতে ঝুঁকে ডাক্তারের কোটটা তুলল সে। হঠাৎ একটা কাগজ পড়ল মেজেতে। কাগজটা কুড়িয়ে নিল কারটন।

'মাই গড!' একনজর চোখ বুলিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সে। 'এ যে দেখছি ডাক্তার আর লুসির প্যারিস ছাড়ার ছাড়পত্র!' নিজের পকেট থেকে একই রকম আরেকটা কাগজ বের করল কারটন। 'আমারটাও রাখুন।'

'তোমারটা কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি। 'তোমার লাগবে না?'

'লাগবে। আপাতত আপনার কাছে রাখুন। পরে নিয়ে নেব। কাল চার্লসকে দেখতে কারাগারে যাব। এগুলো ওখানে না নেওয়াই ভালো।'

'ডাক্তারদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে নাকি?'

'আছে। মার্কুইসদের চিরশত্রু মাদাম দেফার্জ লেগেছে পেছনে। শুনেছি চার্লসের মৃত্যুর পর ডাক্তার আর লুসিকে বন্দি করা হবে। তবে আপনি চেষ্টা করলে ওদের বাঁচাতে পারেন।'

'তা কী করে সম্ভব?' অবাক হয়ে বললেন মিস্টার লরি।

'শুনুন তা হলে। চার্লসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে আগামীকাল বেলা তিনটায়। এর আগ পর্যন্ত ওরা নিরাপদ। কাজেই আগামীকাল সকালের দিকে একটা গাড়ি ভাড়া করে রাখবেন। যেন দুপুর নাগাদ আমরা রওনা হয়ে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে', চিন্তিতভাবে বললেন মিস্টার লরি।

'লুসিকে আজ রাতেই বলে রাখবেন, ওর বাচ্চা এবং বাবার সামনে সমূহ বিপদ। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ও যেন প্যারিস ছেড়ে চলে যায়। বলবেন, এটা ওর স্বামীর শেষ ইচ্ছা। উঠানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমি পৌঁছামাত্র রওনা হয়ে যাবেন সীমান্তের দিকে।'

'তোমার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করব?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি।

'বেশিক্ষণ না। আমার ছাড়পত্র রয়েছে আপনার কাছে। আমি পৌঁছামাত্র গাড়ি ছেড়ে দেবেন। কোনো অবস্থাতেই যেন এ পরিকল্পনা রদবদল না হয়। তা হলে একজনও প্রাণে বাঁচব না। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'এবার তা হলে পৌঁছে দিন উনাকে।'

ডাক্তারের একটা হাত তুলে ঠোঁট ছোঁয়াল কারটন। তারপর বেরিয়ে গেল। রাত তখন অনেক। হেঁটে হেঁটে লুসিদের বাসার কাছে পৌঁছল। একটা ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। তারপর যাবার আগে হাত তুলে শুভ কামনা করল লুসির। আর বিড়বিড় করে বলল, 'বিদায় বন্ধু।'

আরো কিছুক্ষণ হাঁটল কারটন। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম বের করে রাস্তার বাতির নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু লিখল কাগজে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটা ওষুধের দোকানের সামনে গিয়ে থামল। দোকান বন্ধ করার আয়োজন করছে দোকানদার। দ্রুত ঢুকে পড়ল ভেতরে। কাউন্টারের ওপর রাখল কাগজটা।

একনজর চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে তাকাল দোকানি। 'এগুলো কি তোমার নিজের জন্য?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

BanglaInternet.com

'এগুলো একসাথে মেশালে কী হতে পারে জান তো?'

'জানি।'

'তা হলে সাবধান!'

ছোট ছোট কয়েকটা ঠোঙায় ওষুধগুলো ভরে দিল দোকানি। সাবধানে সেগুলো পকেটে ঢোকাল কারটন। তারপর দাম মিটিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। আবার হাঁটতে লাগল উদ্দেশ্যহীনভাবে।

তের

কনসিয়ারগেরি কারাগার। মৃত্যুর প্রহর গুনছে চার্লস ডারনে। ও একা নয়। আরো একান্ন জন হতভাগ্য বন্দি রয়েছে ওর সাথে। কাল সবাইকে ঠেলে দেওয়া হবে গিলোটিনের তলায়। এজন্য মোটেও চিন্তিত নয় ও। জানে, এভাবে কত না নিরপরাধ মানুষ বীরের মতো আলিঙ্গন করেছে মৃত্যুকে। তাই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিয়ে চিঠি লিখতে বসল ও। লুসিকে লিখল, ডাক্তার ম্যানেটের কারাবাসের পেছনে ওর বাপ-চাচার যে ষড়যন্ত্র ছিল তা ও জেনেছে আদালতে ডাক্তারের লেখা বিবরণীটি শোনার পর। লুসির কাছে নিজের আসল পরিচয় কেন গোপন করেছিল তাও লিখল। শেষে ছোট একটা অনুরোধ, বাবা আর ছোট্ট লুসির দিকে যেন খেয়াল রাখে।

মিস্টার লরি আর ডাক্তার ম্যানেটের কাছেও লিখল একটা করে। সন্ধ্যার আগে শেষ করল চিঠি লেখা। এবার শুধু অপেক্ষার পালা। জীবনের কত সুখস্মৃতির কথা মনে পড়ল। লুসির কথা, ছোট্ট লুসির কথা...কত কিছু পাবার আনন্দ, কত কিছু হারাবার বেদনা...সব এসে ভিড় করল চোখের সামনে।

নির্ঘুম কাটল সারাটা রাত। সকাল থেকেই ঘণ্টার শব্দগুলো যেন বিশেষ বার্তা শুনিয়ে যায় ওকে। সাতটা বাজল। জীবনে আর কখনো সাতটা বাজতে শুনবে না ও। আটটা ...দশটা ...বারটা। অবশেষে দুটো। এখনই কারাগার থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে তিনটায়। প্রার্থনা শুরু করল ও।

হঠাৎ পদধ্বনি শোনা গেল বাইরে। কান খাড়া করল চার্লস। কে এল? রক্ষী?

কয়েক সেকেন্ড পর তালায় চাবি ঢোকাবার শব্দ। খুলে গেল দরজা। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল চার্লস। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিডনি কারটন। মুখে মৃদু হাসি। এগিয়ে এসে হাত রাখল চার্লসের কাঁধে।

'চমকে দিয়েছি, না?' ফিসফিস করে বলল কারটন।

'বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমিও কি আমার মতো বন্দি?'

'না। এক রক্ষী আমাকে ঢুকতে সাহায্য করেছে। আমি তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে আসছি। সে তোমাকে অনুরোধ করেছে, আমি তোমাকে যা যা করতে বলব তুমি যেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর। এখন একটা চিঠি লেখ।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিঠি লিখতে বসল চার্লস। ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল কারটন। বলল, 'আমি যা লিখতে বলব শুধু তাই লিখবে। সম্বোধন দরকার নেই।'

'তারিখ?'

'তাও না। লেখ, অনেক দিন আগে তোমাকে একটা কথা দিয়েছিলাম...বলতে বলতে জামার ভেতর হাত ঢোকাল কারটন। বুকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে হাতটা বেরিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল চার্লস। অমনি থেমে গেল কারটনের হাত।

'তুমি কি অস্ত্র বের করছ?' জিজ্ঞেস করল চার্লস।

'না। অস্ত্র নেই আমার কাছে।'

'তা হলে হাতে কী ওটা?'

'কিছু না। লেখ তুমি...এতদিনে সুযোগ এসেছে সেই কথা রাখার..., বলতে বলতে ঝট করে হাতটা বের করে ফেলল কারটন। চেপে ধরল চার্লসের নাকে। কলমটা পড়ে গেল হাত থেকে। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল কারটনের দিকে।

'কিসের গন্ধ' নাক কুঁচকে বলল চার্লস।

'গন্ধ পেলে কোথায়? কলম তোল। তাড়াতাড়ি লেখ। সময় নেই।'

ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল চার্লস। আবার তাড়া লাগাল কারটন, 'কী হল। জলদি কর।'

কলমটা তোলার জন্য ঝুঁকে পড়ল চার্লস। অমনি আবার জামার ভেতর হাত ঢোকাল কারটন। চার্লস সোজা হয়ে বসার আগেই হাতটা বের করে চেপে ধরল নাকে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চার্লস। তৈরি ছিল কারটন। জাপটে ধরল ওকে। দুর্বলভাবে কয়েকটা সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করল চার্লস। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মেজেতে।

দ্রুত হাতে চার্লসের জামাকাপড়, জুতামোজা পরে ফেলল কারটন। চুলগুলোও আঁচড়াল চার্লসের ফ্যাশনে। পেছনে রিবন দিয়ে বাঁধল। নিজের জুতা জামা পরাল চার্লসকে। তারপর দরজার কাছে গিয়ে নিচু স্বরে ডাকল, 'ভেতরে এস।'

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল বরসাদ। 'দেখলে তো কত সহজে কাজ হয়ে গেল', বলতে বলতে চার্লসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কারটন। লেখা কাগজটা ঢুকিয়ে দিল নিজের পকেটে। দাঁড়িয়ে বলল, 'ভয় পাচ্ছ না তো?'

banglainternet.com

'মিস্টার কারটন', বলল বরসাদ, 'তুমি যদি তোমার কথা রাখ তা হলে ভয়ের কিছু নেই।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তোমার পথ থেকে চিরদিনের জন্য সরে যাব আমি। এবার এস, ওকে গাড়িতে তুলে দাও। রক্ষীদের বলবে, ও যখন এখানে এসেছিল তখনই খুব দুর্বল ছিল। মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখন বের কর ওকে। জলদি!'

বেরিয়ে গেল বরসাদ। একটু পরই ফিরে এল দুজন রক্ষী নিয়ে। চার্লসের অজ্ঞান দেহটা ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাইরে।

'আমার বন্ধুকে ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছে দিও', ভেতর থেকে বলল চার্লসবেশী কারটন।

'তুমিও তৈরি হও, এভরেমঁদ', উঁচু গলায় বলল বরসাদ। 'তিনটা বাজতে বেশি বাকি নেই।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চাবি ঘোরাবার শব্দ হল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ। কান খাড়া করে বসে রইল কারটন। কখন আবার শোনা যাবে দরজা খোলার শব্দ।

অবশেষে শোনা গেল সেই প্রত্যাশিত শব্দ। এক রক্ষী ঢুকল ভেতরে। হাতে একটা তালিকা।

'এস আমার সাথে, এভরেমঁদ', বলল সে।

রক্ষীর পেছন পেছন অন্ধকার একটা কক্ষে ঢুকল কারটন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিতে ঠাসা কক্ষটা। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। কেউ পায়চারি করছে, কেউবা কাঁদছে। এখান থেকে হাত বেঁধে সবাইকে গাড়িতে তোলা হবে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল কারটন। কয়েক মিনিট পর একটা মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আঠার-উনিশের মতো বয়স। মিষ্টি চেহারা। ওকেও ধরে আনা হয়েছে সাধারণতন্ত্রের শত্রু বলে। বিপ্লবের সেই দিনে বিচার ছিল প্রহসন। যে কেউ একজন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই হল, তা হলেই গিলোটিন। কারটনের কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। ঠাণ্ডা একটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল কারটনকে।

'নাগরিক এভরেমঁদ, আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি সেই গরিব দর্জির মেয়ে। লা ফোর্সে তোমার সঙ্গে ছিলাম।'

'হ্যাঁ। চিনতে পেরেছি', বিড়বিড় করে বলল কারটন। 'কী অপরাধে যেন তোমাকে আটক করা হয়েছিল?'

'ষড়যন্ত্র। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি নিরপরাধ। আমার মতো গরিব, নিরীহ একটা মেয়ে কী ষড়যন্ত্র করতে পারে!' দু চোখ ভিজে গেল মেয়েটার। 'মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। শুধু দুঃখ, বিনা দোষে মরছি। জানি না, দেশের কী লাভ হবে আমার মৃত্যুতে। নাগরিক এভরেমঁদ, শুনেছিলাম তোমাকে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?'

'ঠিকই শুনেছিলে। পরে আবার আটক করা হয়।'

'নাগরিক এভরেমঁদ, আমাদের যদি একই গাড়িতে করে বধ্যভূমিতে নেওয়া হয়, তোমার হাতটা আমাকে ধরে থাকতে দেবে? আমি ভয় পাচ্ছি না। তবে তোমার হাত ধরে থাকতে পারলে বেশি সাহস পাব।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কারটনের দিকে তাকাল মেয়েটা। সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠল দু চোখে। তারপর বিস্ময়। ধরা পড়ে গেল কারটন। মেয়েটা কিছু বলবার আগেই ওর সরু দুটো আঙুল তুলে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

'তুমি কি ওর জন্য মরতে যাচ্ছ!' জানতে চাইল মেয়েটা।

'হ্যাঁ। ওর স্ত্রী এবং বাচ্চাটার জন্যও।'

'সার্থক মরণ তোমার। এবার তোমার হাতটা কি ধরতে দেবে?'

'দেব, বোন। শেষ পর্যন্ত ধরে থেকো।'

সিডনি কারটন যখন মেয়েটার সাথে কথা বলছে তখন নগর-তোরণের কাছে একটা গাড়ি থামাল বিপ্লবীরা। যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হবে এখানে।

'আপনাদের পরিচয়?' জিজ্ঞেস করল এক রক্ষী। 'কাগজপত্র দেখান।'

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করলেন মিস্টার লরি। কাগজপত্র তুলে দিলেন রক্ষীর হাতে। মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করল রক্ষী। তারপর একে একে নাম ডাকতে শুরু করল।

'আলেকজান্ডার ম্যানেট। ডাক্তার। কে উনি?'

গাড়ির এক কোণে কাত হয়ে পড়ে থাকা ডাক্তার ম্যানেটকে দেখালেন মিস্টার লরি। 'ওই যে ওখানে। উনি অসুস্থ। কথা বলতে পারছেন না।'

'লুসি, আলেকজান্ডার ম্যানেটের মেয়ে। ফরাসি। সে কোথায়?'

'এই যে এখানে', লুসিকে দেখিয়ে দিলেন মিস্টার লরি।

লুসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল রক্ষী, 'উনি তো এভরেমঁদের স্ত্রী, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সিডনি কারটন। আইনজীবী। ইংরেজ। উনি কোন জন?'

'ওই যে ওখানে', আঙুল তুলে দেখালেন মিস্টার লরি। 'শেষ মাথায়।'

'অজ্ঞান নাকি? কী হয়েছে?'

'এভরেমঁদের বন্ধু কিনা। শোকের ধাক্কাটা সামলাতে পারে নি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।'

banglainternet.com

'জারভিস লরি। ব্যাংকার। ইংরেজ। কে? আপনি?'

'হ্যাঁ।'

কাগজপত্রগুলো আরেকবার উলটেপালটে পরীক্ষা করল রক্ষী। তারপর ফেরত দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আছে। যেতে পারেন আপনারা।'

তোরণ পেরিয়ে ধীরগতিতে এগোল গাড়ি।

কখনো পাহাড়ি পথে, কখনো গ্রামের পথ ধরে ছুটে চলেছে ওরা। সন্ধ্যায় একবার থামতে হল ঘোড়া বদলের জন্য। তারপর আবার ছুটে চলা। কোনায় বসে থাকা লোকটার জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

'কারটন কোথায়!' জড়ানো গলায় বলল সে।

ডাক্তার ম্যানেটদের গাড়ি যখন সীমান্তের দিকে ছুটে চলেছে, মাদাম দেফার্জ তখন জ্যাকদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত।

'শোন', জ্যাক তিনকে বলল সে। 'ডাক্তার ম্যানেট বাঁচল কি মরল তাতে আমার কিছু এসে যায় না। তা নিয়ে আমি মাথাও ঘামাই না। আমি চাই এভরেমঁদ পরিবারের একটি প্রাণীও যেন বাঁচতে না পারে।'

'ওর বউ আর বাচ্চাকেও মরতে হবে', বলল জ্যাক তিন। 'সব ক'টাকে লাইন ধরে গিলোটিনে পাঠাব।'

'এ ব্যাপারে আমার স্বামীকে কিন্তু এক বিন্দু বিশ্বাস করতে পারছি না', বলে চলেছে মাদাম দেফার্জ। 'ও টের পেলে আগেভাগেই ডাক্তারকে সাবধান করে দেবে। সুতরাং যা করার আমাকেই করতে হবে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'লুসিদের বাসায় যাচ্ছি আমি। তিনটার সময় গিলোটিনের ওখানে দেখা হবে। আমার উল-কাঁটা নিয়ে যাও। জায়গা রেখো। আজ কিন্তু অনেক লোক হবে।'

রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে মিস প্রস আর জেরি ক্রাঞ্চার। লুসিরা বেরিয়ে গেছে আরো কুড়ি মিনিট আগে। ওরা রওনা হবে আরো দশ মিনিট পর। এ পরিকল্পনা মিস্টার লরির। গত রাতেই সব ঠিক করে রেখেছেন তিনি। ওরা দুজন যাবে হালকা এবং দ্রুতগামী গাড়িতে। তাতে আধ ঘণ্টা পর রওনা হলেও ধরে ফেলতে পারবে আগের গাড়িকে।

'জেরি', গোছগাছ শেষ করে বলল মিস প্রস। 'এক বাড়ি থেকে একই দিনে দু-দুটো গাড়ি বের হওয়া ঠিক হবে না। বিপ্লবীদের সন্দেহ হতে পারে।'

'কথাটা ঠিকই বলেছ', বলল জেরি।

'তা হলে এক কাজ কর। গাড়ি আসার এখনো দশ মিনিট বাকি। তুমি এখনই বেরিয়ে যাও। গাড়ি থামিয়ে ক্যাথেড্রালের কাছে অপেক্ষা কর। তিনটার মধ্যে পৌঁছে যাব আমি।'

বেরিয়ে গেল জেরি ক্রাঞ্চার। তার কয়েক মিনিট পর বাড়িতে ঢুকল মাদাম দেফার্জ।

'এভরেমঁদের বউ কোথায়?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল সে।

'কী দরকার?' জিজ্ঞেস করল মিস প্রস।

'দেখা করতে চাই।'

'দেখা হবে না।'

'দেখা না করে যাব না', ধমকের সুর মাদাম দেফার্জের কণ্ঠে। 'ওকে লুকিয়ে রেখে লাভ হবে না। বল গিয়ে আমি দেখা করতে চাই।'

'না। বলব না। বদমায়েশ মহিলা।'

'শুয়োরের বাচ্চা!' চিৎকার করে উঠল মাদাম দেফার্জ। 'ধাড়ি শুয়োর কোথাকার। পথ ছাড় আমার। ভেতরে যেতে দে।' মিস প্রসের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল সে।

'খবরদার!' চোখ পাকিয়ে বলল মিস প্রস। 'আমার গায়ে যদি হাত তুলিস, তোর মাথার একটা চুলও রাখব না আমি।'

'কী! এত বড় স্পর্ধা!' অগ্নিমূর্তি ধারণ করল মাদাম দেফার্জ। 'আমার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছিস! এর মজা টের পাবি। আগে ডাক্তারকে ডাকি।' মিস প্রসের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল সে, 'নাগরিক ডাক্তার! এভরেমঁদের বউ! কে আছ বাড়িতে। জবাব দাও। আমি নাগরিকা দেফার্জ।'

জবাব দিল না কেউ। কেমন যেন সন্দেহ হল মাদাম দেফার্জের। আচমকা এক ধাক্কায় মিস প্রসকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে গিয়ে পরপর খুলে ফেলল তিনটা ঘরের দরজা। নেই কেউ। শূন্য ঘর। তাড়াহুড়ো করে মালপত্র সরানো হয়েছে। মেজের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কিছু কিছু। শেষ ঘরটার দিকে এগোবার সময় সামনে এসে দাঁড়াল মিস প্রস।

'সরে দাঁড়া', আদেশ করল মাদাম দেফার্জ। 'ওই ঘরটাও দেখতে দে।'

'না।' ফোঁস করে উঠল মিস প্রস। 'কক্ষনো না।'

মুহূর্তে বাঘিনীর রূপ ধারণ করল মাদাম দেফার্জ। মিস প্রসকে আঘাত করার জন্য হাত তুলল। প্রস্তুত ছিল মিস প্রস। সঙ্গে সঙ্গে কোমর জড়িয়ে ধরল মাদামের। শুরু হল ধস্তাধস্তি। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাদাম। না পেরে এক খামচি বসিয়ে দিল মিস প্রসের মুখে। মাংস তুলে ফেলল। তবুও ছাড়ল না মিস প্রস। মাথা নিচু করে জাপটে ধরে রইল মাদাম দেফার্জকে।

banglainternet.com

কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর চট করে কৌশল পরিবর্তন করল মিস প্রস। সজোরে কাঁধ দিয়ে ঠেলে দেয়ালের দিকে নিয়ে যেতে লাগল মাদামকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চমকে উঠল মাদাম দেফার্জ। মিস প্রসের ওই ভারী শরীরের এক ধাক্কাতেই পাঁজরের হাড় সব গুঁড়ো হয়ে যাবে তার। মুক্ত হবার শেষ চেষ্টা করল মাদাম দেফার্জ। কিন্তু বৃথা গেল সব। মৃত্যুভয় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করল সে। হাত ঢোকাল বুকের কাছে। মুখ তুলে তাকাল মিস প্রস। পিস্তলটা দেখল। তখনো পুরো বেরোয় নি পোশাকের আড়াল থেকে। চট করে মাদামকে ছেড়ে দিল মিস প্রস। বিদ্যুৎ-গতিতে আঘাত করল মাদামের বুকে। পিস্তল ধরা হাতের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোর ঝলকানি। তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ। পিছিয়ে এল মিস প্রস। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল সবকিছু। ধীরে ধীরে কেটে গেল ধোঁয়া। আর তখনই মাদাম দেফার্জকে দেখতে পেল মিস প্রস। চিৎ হয়ে মেজেতে পড়ে রয়েছে। মৃত।

ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে এল মিস প্রসের শিরদাঁড়া বেয়ে। ছুটে বেরিয়ে গেল লোকজন ডাকার জন্য। পরমুহূর্তেই ভেবে দেখল, তাতে সমস্যা আরো বাড়বে। জেরার পর জেরা চলবে। হয়তো খুনের দায়ে ফেঁসে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ভেতরে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটা ব্যাগে ভরল। বাইরে এল আবার। ডানে-বাঁয়ে একবার চোখ বুলাল। দরজায় তালা লাগাল। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল বড় রাস্তার দিকে।

ক্যাথেড্রালটা বাড়ি থেকে একটু দূরে। ভাগ্য ভালো, সঙ্গে একটা স্কার্ফ ছিল। নইলে মুখে নখের আঁচড় আর উস্কখুস্ক চুল নিয়ে রাস্তায় হাঁটা দায় হত। স্কার্ফ দিয়ে মুখ আর মাথা ঢেকে দ্রুত পা চালাল ক্যাথেড্রালের দিকে।

নিরাপদেই পৌঁছল। জেরি ক্রাঞ্চার আসে নি তখনো। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরই গাড়ি নিয়ে হাজির হল জেরি।

'রাস্তায় কোনো গোলমাল হচ্ছে?' কিছুক্ষণ চলার পর জিজ্ঞেস করল মিস প্রস।

'না', বলল জেরি। 'সব সময় যেমন থাকে তেমনই আছে।'

'তোমার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।' বলল মিস প্রস। 'কী বললে তুমি?'

আগের কথাই বলল জেরি। কিন্তু এবারও শুনতে পেল না মিস প্রস। আধ ঘণ্টার মধ্যে কালা হয়ে গেল নাকি মেয়েটা, ভাবল জেরি।

'সত্যি বলছি কিছু শুনতে পাচ্ছি না', আবার বলল মিস প্রস। 'কিছুই না। শুধু একবার আলোর ঝলকানি দেখলাম। তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ। মনে হয় ওই শব্দটাই আমার জীবনে শোনা শেষ শব্দ।'

সত্যি তাই। বাকি জীবনে আর কিছুই শুনতে পায় নি মিস প্রস।

চৌদ্দ

কয়েদি বোঝাই ছ'টা গরুর গাড়ি এগিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে। বাহান্ন জন বন্দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে। এদের মধ্যে রয়েছে অভিজাত, জমিদার, ধনী, গরিব, নানা পেশার নানা বয়সী বন্দি। সবাই এরা সাধারণতন্ত্রের শত্রু। গাড়িগুলোর আগে-পিছে চলেছে ছ'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী।

প্রথম প্রথম রাস্তার দু পাশে ভিড় জমে যেত এদের দেখার জন্য। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসত লোকজন। কিন্তু এখন আর ওদিকে তাকায় না কেউ। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তবে আজকের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আজ একজন বিশেষ বন্দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে। এজন্যই রাস্তার দু পাশে উপচেপড়া ভিড়। অনেকে প্রশ্ন করছে অশ্বারোহীদের, 'এভরেমঁদকে কোন গাড়িতে নেওয়া হচ্ছে?'

'ওই যে তৃতীয় গাড়িতে', তলোয়ার উঁচিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অশ্বারোহীরা।

অমনি সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে জনতার দৃষ্টি। মাথা নিচু করে বসে রয়েছে এভরেমঁদ। পাশে বসা এক মেয়ের সাথে কথা বলছে। ওর একটা হাত ধরে রয়েছে মেয়েটা।

বেলা তিনটার কিছু আগে বধ্যভূমিতে পৌঁছল গাড়ির বহর। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে। এভরেমঁদের শিরশ্ছেদ দেখবে তারা। ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন মন্তব্য করল, 'ওর বাপ-চাচারা যেমন করে মানুষের গলা কেটেছে তেমনি ওর গলাও কেটে ফেল।'

দর্শকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কম নয়। গিলোটিনের একেবারে কাছ ঘেঁষে চেয়ারে বসেছে মাদাম দেফার্জের সঙ্গিনীরা। সবার হাতে উল আর কাঁটা। মাদাম দেফার্জের জন্য জায়গা রাখা হয়েছে। কয়েদিরা পৌঁছতেই অস্থির হয়ে উঠল তারা।

'থেরেসি কোথায়?' চিৎকার করে উঠল একজন। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলাল। 'থেরেসিকে দেখেছ কেউ তোমরা?'

'তাই তো!' উল বুনতে বুনতে বলল আরেকজন। 'ও তো অনুপস্থিত থাকে না কখনো।'

banglainternet.com

'আজো থাকবে না', বলল প্রথম জন। আবার চিৎকার করে উঠল সে, 'থেরেসি! থেরেসি দেফার্জ! তুমি কোথায়?'

সাড়া নেই থেরেসির।

'কী হবে এখন?' প্রায় কেঁদে ফেলল মহিলা। 'কয়েদিরা এসে গেছে। একটু পরই তোমার চিরশত্রু এভরেমঁদের গলা কাটা হবে। আর তুমি এলে না!' হতাশ মনে বসে পড়ল সে।

প্রথম গাড়ি থেকে কয়েদি নামানো শুরু হল। আলখেল্লা পরা জল্লাদরা তৈরি। প্রথম বন্দিকে নেওয়া হল গিলোটিনে। বিদ্যুদ্বেগে নেমে এল চকচকে ফলাটা।

'ঘ্যাঁচ!' গড়িয়ে পড়ল একটা মাথা।

মহিলারা গুনল, 'এক।'

'ঘ্যাঁচ!'

মহিলারা গুনল, 'দুই।'

এর পর শুধু ঘ্যাঁচ! ঘ্যাঁচ! ঘ্যাঁচ!

উল বুনতে বুনতে গুনে চলেছে মহিলারা, 'তিন...চার...পাঁচ...,

প্রথম গাড়ি শেষ। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় গাড়িও।

এবার তৃতীয় গাড়ি। কারটন নামল গাড়ি থেকে। পেছনে সেই মেয়েটা। এখনো হাত ধরে রয়েছে কারটনের। মেয়েটাকে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাল কারটন। যাতে পেছনে গিলোটিনের বীভৎস দৃশ্য দেখতে না পারে।

'একটুও ভয় করছে না আমার', বলল মেয়েটা। 'মনে হচ্ছে তুমি যেন অমরলোক হতে নেমে এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে। তোমার হাত ধরে আছি বলে একটুও ভয় করছে না আমার।'

'তোমার সময় এলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে শুধু', বলল কারটন। 'অন্য কোনো দিকে তাকিয়ো না। অন্য কারো কথা ভেবো না। চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে সব।'

'ওরা তাড়াতাড়ি করবে তো?'

'হ্যাঁ। তুমি কিছু টেরই পাবে না।'

অবশেষে কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল মেয়েটা।

'সময় হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দিল না কারটন। মেয়েটার একটা হাত তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল। শেষবারের মতো দুটো আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি মেলে তাকাল মেয়েটা। ভয়ের লেশমাত্র নেই সেই দৃষ্টিতে। আছে শুধু গভীর প্রশান্তি আর অপরিসীম প্রবল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গেল গিলোটিনের দিকে।

banglainternet.com

কারটনকে আর দেখতে পাচ্ছে না এখন। মনে হল, যেন অদৃশ্য এক অবয়ব তার সামনে দণ্ডায়মান। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপলক সেদিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা।

উল বুনতে বুনতে মহিলারা গুনল 'বাইশ।'

এবার কারটনের পালা। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল কারটন। ভণ্ড বিচারকদের ভাবগম্ভীর মুখ, আলখেল্লা পরা জল্লাদদের রক্তলোলুপ দৃষ্টি আর শত-সহস্র জনতার উল্লাস ছাপিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। এক মা তার সন্তানের কাছে রূপকথার গল্প বলছে। দুঃসাহসী এক বীরের গল্প। সেই বীরের নাম সিডনি কারটন।

বিশ্বজয়ের হাসি ফুটে উঠল কারটনের মুখে। থমকে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মাণ সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকাল একবার। বুক ভরে শ্বাস টানল। তারপর বীরের মতোই উঠে পড়ল বেদিতে।

হঠাৎ মনে হল, ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল পৃথিবীটা। সেইসঙ্গে সুতীব্র গর্জন করে ছুটে এল উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সবকিছু। তারপর শুধু মৃত্যু, নিথর স্তব্ধতা।

মহিলারা গুনল, 'তেইশ।'